# স্মৃতিকথা

## চতুর্থ পর্ব

শ্রীউপেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায়

ডি. এম. লাইব্রেরী
৪২, কর্ণওয়ালিস স্ট্রীট, কলিকাতা ৬

শ্রীঅমরেন্দ্রনাথ সরকার
শ্রীগিরীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়
শ্রীনলিনীমোহন শাস্ত্রী
শ্রীপ্রমথনাথ সেন

বন্ধুবরেষু

## এই লেখকের বই :

| | |
|---|---|
| মায়াবতী পথে | ৩৷৹ |
| স্মৃতিকথা—১ম, ২য়, ৩য়, প্রতি খণ্ড | ৩৷৹ |
| ঐ ৪র্থ খণ্ড | ২৷৹ |
| অমলা ( ২য় সংস্করণ ) | ৩৷৹ |
| অভিজ্ঞান ( ৩য় সংস্করণ ) | ৫৲ |
| অনুরাগ ( ২য় সংস্করণ ) | ৪৷৹ |
| শশিনাথ ( ৩য় সংস্করণ ) | ৪৷৹ |
| বিদুষী ভার্যা ( ৩য় সংস্করণ ) | ৩৷৹ |
| যৌতুক ( ২য় সংস্করণ ) | ২৷৹ |
| সোনালী রঙ ( ২য় সংস্করণ ) | ৪৷৹ |
| নাস্তিক | ৩৲ |
| রাজপথ ( ৫ম সংস্করণ | ৪৲ |
| ছদ্মবেশী ( ৪র্থ সংস্করণ ) | ৩৲ |
| অমূলতরু ( ৩য় সংস্করণ ) | ৩৲ |
| দিক্‌শূল ( ২য় সংস্করণ ) | ৪৷৹ |
| আশাবরী ( ২য় সংস্করণ ) | ৪৲ |
| রাতজাগা ( ২য় সংস্করণ ) | ১৷৹ |
| রাজপথ ( নাটক ) | ২৲ |
| কমিউনিস্ট্‌ প্রিয়া | ২৸৹ |
| নবগ্রহ | ১৷৹ |
| বৈতালিক | ১৷৹ |
| গিরিকা | ১৷৹ |
| ভারত-মঙ্গল ( নাটিকা ) | ১৷৹ |

# স্মৃতিকথা

## চতুর্থ পর্ব

### ১

ইংরাজী Heredity শব্দের একটি মাত্র অদীর্ঘ কথায় বাংলা প্রতিশব্দ কি আছে, অথবা আদৌ আছে কি-না, তা আমি জানি নে; থাকলেও উপস্থিত তা আমার মনে পড়ছে না। যদি বলি বংশপরম্পরাগত গুণ অথবা কৌলিক গুণাধিকার, তা হ'লে Heredity শব্দের বাংলা ভাবা[illegible]তো খানিকটা প্রকাশ করা হয়, কিন্তু বাংলা প্রতিশব্দ বলা হয় না।

শব্দের প্রধান প্রয়োজন ধাতুমূলক অর্থনির্দেশ, সে কথা স্বীকার করি; কিন্তু শব্দের বিভিন্ন গুণাবলীর অন্যতম গুণ অনতিদীর্ঘতা, সে কথাও অস্বীকার করা চলে না। সমাসনিবদ্ধ হাত দেড়েক লম্বা একটা শব্দ ভাষার সাবলীলতার পদে প্রস্তরখণ্ড। সে প্রস্তরখণ্ড ভাষার গতিকে খণ্ডিত ক'রে মন্থর করে।

এই প্রসঙ্গে শব্দের অতিদীর্ঘতার দুঃখ সম্বন্ধে বহুদিনকার একটা পুরাতন কাহিনী মনে প'ড়ে গেল। আমরা তখন সবেমাত্র স্কুলের শেষ-সীমা অতিক্রম ক'রে কলেজের প্রাঙ্গণে প্রবেশ করেছি। ভবানীপুর-সাহিত্য-সমিতি চলেছে সগৌরবে এবং পূর্ণোদ্যমে। আমরা কয়েকজন বন্ধু এবং সহপাঠী তার উৎসাহশীল সদস্য।

ইংরাজী Punctuality শব্দের বাংলা প্রতিশব্দ কি হতে পারে, তাই নিয়ে একদিন আমাদের মধ্যে সমস্যা দেখা দিলে। অনেক চেষ্টা-

চরিত্র ভাবনা-চিন্তার দ্বারাও আমরা কোন সিদ্ধান্তে উপনীত হতে পারি নে। প্রত্যেকেই এক-একটা শব্দ রচিত করি, কিন্তু আর কারো তা পছন্দ না হওয়ায় নাকচ হয়ে যায়।

তখনকার দিনে আমরা ভারতবর্ষীয়েরা, বিশেষত বাঙালীরা, মনে-প্রাণে আলস্যবিলাসী। আলস্যের মন্ত্রগুরু দীর্ঘসূত্রতার সহিত আমাদের ঘনিষ্ঠ পরিচয়। তাই বেণীমাধব গাঙ্গুলীর 'Translation and Re-translation' গ্রন্থে Procrastination-এর প্রতিশব্দ 'দীর্ঘসূত্রতা' পাওয়া গিয়েছিল : 'Procrastination is the thief of time—দীর্ঘসূত্রতা সময়াপহারক' অনুবাদের মধ্যে। Punctuality-র বিষয়ে বেণীমাধবের 'Translation and Retranslation' কিন্তু নির্বাক। 'দীর্ঘসূত্রতা সময়াপহারক' বাক্যটির মধ্যে বেণীমাধব অবশ্য Punctua-lity-র সপক্ষে ওকালতির সূত্রপাত করেছিলেন; কিন্তু সময় রক্ষা ক'রে চলার গুণটিকে ইংরাজী Punctuality শব্দ হতে বাংলার প্রতিশব্দে মুক্তিদান করতে সক্ষম হন নি তিনি।

Punctuality শব্দের বাংলা প্রতিশব্দ নির্ণীত করতে অসমর্থ হয়ে আমরা অবশেষে আমাদের সহপাঠী বন্ধুবর নলিনীমোহন মুখোপাধ্যায়ের শরণাপন্ন হলাম। নিম্নশ্রেণী হতে নলিনী সংস্কৃত ভাষায় দড়। প্রত্যেক পরীক্ষাতেই সে সংস্কৃতে প্রথম স্থান অধিকার ক'রে এসেছে। পরে সংস্কৃত ভাষায় এম. এ পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়ে 'শাস্ত্রী' উপাধি লাভ করে। একদা শ্রীহট্ট গভর্নমেণ্ট কলেজের সুযোগ্য অধ্যক্ষ নলিনী শাস্ত্রীকে না চিনত এবং না শ্রদ্ধা করত, আসাম প্রদেশে লেখাপড়া-জানা এমন লোকই ছিল না।

নলিনী অবিলম্বে আমাদিগকে আমাদের কাঙ্ক্ষিত বস্তু দান করলে,—যাথাসাময়িকতা। পেলাম বটে, কিন্তু মনের মধ্যে গভীর খোঁচাও

পেলাম। সাড়ে পাঁচটার মীটিঙে হন্তদন্ত ক'রে কোন রকমে সাড়ে পাঁচটার সময়ে উপস্থিত হতে পারলে যাথাসাময়িকতা রক্ষা করা হবে? এ কি ব্যাপার! বেলা দশটার সময়ে আসবে ব'লে নাপিত এগারোটার সময়ে এলে তাকে বলতে হবে, ওহে, তুমি আর একটু যথাসাময়িক হতে পার না? তবেই হয়েছে!

নলিনী আমাদের আশ্বাস দিলে যাথাসাময়িকতা পদটি প্রত্যয়-প্রকরণের কয়েকটি পয়ঃপ্রণালী নির্বিঘ্নে পার হয়ে আমাদের তটে পৌঁছেছে,—সুতরাং তার ব্যাকরণ-বিশুদ্ধির বিষয়ে অপ্রত্যয়ের কোনো কারণ নেই। কি উপায়ে 'যথাসময়' 'যাথাসাময়িকে', এবং 'যাথাসাময়িক' 'যাথাসাময়িকতা'য় উপনীত হতে পারল, সে বিষয়ে নলিনী আমাদিগকে একটি বৈয়াকরণ ব্যাখ্যা দিয়ে বললে, পদটি শুধু ব্যাকরণসম্মতই হয় নি, পরন্তু সুললিতও হয়েছে।

আমরা যখন ব্যাকরণ-কৌমুদীর অনুজ্জ্বল জ্যোৎস্নালোকে হোঁচট খাচ্ছি, নলিনী তখন মুগ্ধবোধ-পাণিনি-মহাসাগরের তলদেশ মথিত ক'রে জ্ঞানের মণিমুক্তা আহরণের দ্বারা নিজেকে পণ্ডিত ব'লে সপ্রমাণ করেছে। সুতরাং প্রকাশ্যে নিরুত্তর থেকে আমরা মনে মনে বললাম, রাজার নন্দিনী তুমি, যা বল তা শোভা পায়। মনের মধ্যে কিন্তু যাথা-সাময়িকতার বিরুদ্ধে একটা জোর অবাঞ্ছা জাগ্রত হয়ে রইল।

সৌভাগ্যক্রমে অল্পদিনের মধ্যেই যাথাসাময়িকতার অষ্টপাশ থেকে মুক্তি লাভ করবার একটা সুযোগ দেখা দিলে। আমাদের সাহিত্য-সমিতির বার্ষিক উৎসবের সময়ে প্রতি বার আমরা কোনো-না-কোনো বিশিষ্ট সাহিত্যিককে সভাপতির পদের জন্য সংগ্রহ করতাম। সেবার রবীন্দ্রনাথকে সভাপতিরূপে লাভ করবার উচ্চাকাঙ্ক্ষা আমাদের মনে জাগ্রত হ'ল। যত দূর মনে পড়ে, সৌরীন্দ্রমোহন মুখোপাধ্যায়, প্রমথনাথ

সেন, শ্যামরতন চট্টোপাধ্যায় ও আমি—বন্ধুচতুষ্টয়, একদিন জোড়াসাঁকোয় রবীন্দ্রনাথের গৃহে গিয়ে হাজির হলাম। সে সময়ে রবীন্দ্রনাথ অসুস্থ ছিলেন ব'লে সভাপতির পদ গ্রহণ করতে পারলেন না, কিন্তু আমাদের সাহিত্য-সমিতির প্রতি সহানুভূতিশীল এবং আগ্রহশীল হয়ে সে বিষয়ে অনেক আলাপ-আলোচনা করলেন।

কথায় কথায় এক সময়ে আমি বললাম, "একটা বিষয় নিয়ে আমরা একটু কাতর হয়ে আছি, আপনি যদি দয়া ক'রে একটা উপায় করেন।"

আমার অনুরোধ শুনে যৎপরোনাস্তি কৌতূহলী হয়ে রবীন্দ্রনাথ বললেন, "বল কি হে! তোমরা কাতর হয়ে আছ,—আর আমি তার উপায় করতে পারি?"

বললাম, "আমার তো মনে হয় নিশ্চয় পারেন।"

"কি ব্যাপার বল দেখি?"

বললাম, "ইংরাজী 'পাংচুয়ালিটি' শব্দের ছোটখাট বাংলা প্রতিশব্দ কি হবে, তা আমরা কিছুতেই ঠিক ক'রে উঠতে পারছিলাম না। আমাদের একজন সংস্কৃতবিশারদ বন্ধু 'পাংচুয়ালিটি'র বাংলা করেছেন 'যাথা-সাময়িকতা'। তিনি বলেন, যথাসাময়িকতা ব্যাকরণশুদ্ধ; কিন্তু এত লম্বা কথা আমরা কিছুতেই বরদাস্ত করতে পারছি নে।"

আমার কথা শুনে রবীন্দ্রনাথ একটু চিন্তা করলেন; তার পর বললেন, "পাংচুয়ালিটি'র বাংলা 'সময়নিষ্ঠা' হতে পারে; কাজে কাজেই 'পাংচুয়ালে'র বাংলা 'সময়নিষ্ঠ'।"

একটা অন্ধকার ঘরে সুইচ নামিয়ে দিলে সহসা ঘরটা যেমন আলোকিত হয়ে ওঠে, আমাদের মনও ঠিক তেমনিভাবে আনন্দে উদ্ভাসিত হয়ে উঠলো। কি চমৎকার! যেমন অদীর্ঘ, তেমনি শ্রুতিমধুর,

আর তেমনি অর্থব্যঞ্জক! গভীর জ্ঞান এবং সৌন্দর্যবোধের ধরনই আলাদা!

এর পূর্বে রবীন্দ্রনাথ 'সময়নিষ্ঠা' শব্দ নিজে কখনো ব্যবহার করেছিলেন কি-না, অথবা অপরকে ব্যবহার করতে দেখেছিলেন কি-না, তা জানি নে; কিন্তু যে ভাবে তিনি আমার কথা শুনে একটু চিন্তা ক'রে তার পর কথাটি বলেছিলেন, তাতে আমার দৃঢ়বিশ্বাস, সেই দিন সেই সময়েই তিনি কথাটি রচিত করেছিলেন। অর্থাৎ 'সময়নিষ্ঠা' এবং 'সময়নিষ্ঠ' শব্দ দুটি সেই দিনই প্রথম সৃষ্টিলাভ করেছিল।

'যাথাসাময়িকতা'কে পশ্চাতে ফেলে হালকা মন নিয়ে আমরা সেদিন ভবানীপুরে ফিরেছিলাম।

যে কথা বলছিলাম, এবার সেই কথা আরম্ভ করি। কথা হচ্ছিল, Heredity শব্দের বাংলা প্রতিশব্দ কি হতে পারে? Heredity শব্দের সুবিধামতো বাংলা কিন্তু না থাকলেও, সৌভাগ্যক্রমে Hereditary শব্দের এমন এক পরিচ্ছন্ন ছোটখাট বাংলা প্রতিশব্দ আছে, যা থেকে Heredity-র বাংলা প্রতিশব্দ সহজেই গ'ড়ে নেওয়া যেতে পারে। সে প্রতিশব্দ হচ্ছে,—'বংশগত'। Diabetes is a hereditary disease—এই ইংরাজী বাক্যের বাংলা অনুবাদ যদি করি, বহুমূত্র একটি বংশগত ব্যাধি, তা হ'লে ইংরাজী ব্যাক্যটির অর্থ যথাযথভাবেই ব্যক্ত হয়। সুতরাং 'বংশগত' শব্দটি হতে Heredity-র বাংলা প্রতিশব্দ যদি 'বংশগতি' করি, তা হ'লে বোধ হয় তেমন কিছু অন্যায় হয় না।

হঠাৎ মনে হতে পারে, একটু হয়তো হয়। বংশগতি শব্দের বৈয়াকরণ নিষ্পত্তিই বা কি ক'রে খাড়া করানো যায়? আর, তার অর্থনির্দেশই বা তেমন স্পষ্ট হতে পারছে কই?

এ দুটি আপত্তিরই কিন্তু জবাব দেওয়া চলে। 'বংশগাত'র পরিপূর্ণ অবয়ব যদি করি 'বংশপরম্পরাগত গতি', তার পর মধ্যপদ 'পরম্পরাগত'টুকু লোপ ক'রে দিয়ে যদি পাই 'বংশগতি',—তা হ'লে মধ্যপদলোপী কর্মধারয় হয় কি-না সে কথা পণ্ডিতেরা বিবেচনা করতে পারেন; কিন্তু আমাদের কর্ম সিদ্ধ হয়। আর, অর্থনির্দেশ সম্বন্ধে এ কথা নিশ্চয় বলা চলে, 'বংশগতি'র মধ্যে Heredity-র খানিকটা অর্থ আছেই; বাকিটুকু কিছুদিন ব্যবহার করতেই বংশগতির উপর জ'মে যাবে। ইংরাজীতে Polarisation of Words ব'লে একটি তথ্য আছে, যার অর্থ—কোনো এক বিশেষ অর্থে কোনো শব্দ যদি দীর্ঘকাল ব্যবহৃত হতে থাকে, তা হ'লে সেই বিশেষ অর্থটি সেই শব্দের উপর পাকাপাকিভাবে দানা বাঁধে।

হিন্দী 'বাবু' অথবা 'বাবুজী' শব্দের অর্থ পিতা। আমরা বাঙালীরা বলি 'বাবা', হিন্দুস্থানীরা বলে 'বাবু'। প্রথম যেদিন ইংরাজ ভারতবর্ষীয়কে সম্বোধন করবার প্রয়োজন বোধ করেছিল, আপ্যায়িত করবার অভিপ্রায়েই সে তৎকালীন আত্মীয়তাসূচক এবং সম্মানার্হ পদ 'বাবু' পছন্দ ক'রে নিয়েছিল। কিন্তু কালক্রমে এই 'বাবু' শব্দ সাধারণত কেরানী-সম্প্রদায় এবং নিম্নপদস্থ ভারতবর্ষীয়দের প্রতি প্রযুক্ত হতে হতে সে শুধু তার মহিমাই হারায় নি, পরন্তু অবজ্ঞা ও অসম্মানের একটা হেতু হয়েও দাঁড়িয়েছিল। তাই উচ্চপদস্থ, বিশেষত হ্যাট-কোট-প্যাণ্ট-ব্যবহারকারী, কোন ভারতবর্ষীয়কে কোনো সাহেব 'মিস্টারে'র পরিবর্তে 'বাবু' ব'লে সম্বোধন করলে অপমানে ও অভিমানে উক্ত ভারতবর্ষীয়ের কর্ণমূল আরক্ত হয়ে উঠত, - যদিও 'বাবু' সম্বোধনের দ্বারা উক্ত ভারতবর্ষীয়, শব্দের প্রকৃত অর্থ হিসাবে, 'হে পিতঃ!' ব'লেই সম্বোধিত হ'ত। সাহেবের মুখের 'বাবু' শব্দ অবজ্ঞাসূচক অর্থে polarised হয়েছিল।

ভাষাতত্ত্বের আলোচনা এইখানেই নিরস্ত হোক, এবার অন্য কথা বলি।

আমি একজন সাহিত্যিক, সে কথা বললে, আশা করি, শুধু একটা ঘটনার কথাই বলা হবে, বিশেষ কিছু অহমিকা প্রকাশ করা হবে না। যে ব্যক্তি সাহিত্য বিষয়ে কোনো পুস্তক মুদ্রিত ক'রে প্রকাশ করেছে, সাহিত্যিকের সাধারণ সংজ্ঞা অনুসারে সে একজন সাহিত্যিক। যে-হেতু আমিও কয়েকখানা বই আমার নামে মুদ্রিত ক'রে প্রকাশিত করেছি, সুতরাং আমাকেও একজন সাহিত্যিক বলা চলে।

আমি যদি সাহিত্যিক, অল্পাধিক মাত্রায় আমার সাহিত্যপ্রবণতা আছে—সে কথাও স্বীকার করতে হয়। অন্যথা উপন্যাস রচনার দিকে মনোযোগী না হয়ে মন্ত্রীত্বলাভের পথে অগ্রসর হলাম না কেন? সাহিত্য-প্রবণতার অস্তিত্ব যদি স্বীকার করা যায়, তা হ'লে পরবর্তী প্রশ্ন হয়,—এই সাহিত্যপ্রবণতা আমরা অর্জন করি আমাদের এই জীবনেই বিদ্যাবুদ্ধি-জ্ঞানের ক্ষেত্র থেকে, অথবা পূর্বজন্ম হতে রক্তের সহিত এ বস্তু, অন্তত এর খানিকটা অংশ, আমরা বহন ক'রে আনি? অর্থাৎ, সাহিত্যপ্রবণতার বিষয়ে বংশগতিবাদ প্রযোজ্য, অথবা অপ্রযোজ্য? আমাকে যদি এ বিষয়ে প্রশ্ন করা হয়, আমি বলব, খুব সম্ভবত প্রযোজ্য।

এর পর যদি কেউ আমাকে জিজ্ঞাসা করে,—যদি প্রযোজ্য, তুমি কোন্ দিক থেকে সাহিত্যপ্রবণতা পেয়েছ? পিতৃদিক থেকে, অথবা মাতৃদিক থেকে? তা হ'লে আমি নিঃসংশয়ে বলব, যদি কোনো দিক থেকে পেয়ে থাকি, মাতৃদিক থেকেই শুধু নয়, খোদ মাতৃদেবীর কাছ থেকে পেয়েছি।

পিতৃদিক থেকে যে পাই নি, সে কথাও নিঃসংশয়েই বলতে পারি। সাহিত্য বিষয়ে আমাদের পিতৃদিকটা ছিল একেবারে মরুভূমি। লতা—পাদপের কথা তো [illegible] অতীত, তৃণগুল্মও সে মরুভূমিতে দেখা

যেত না। আমার পিতাঠাকুররা ছিলেন পাঁচ সহোদর। সকলের বিষয়েই এ কথা প্রযোজ্য। তাঁরা ছিলেন পারস্য ভাষায় ব্যুৎপন্ন।

অন্য ভাইদের কথা ঠিক বলতে পারি নে, কিন্তু আমার পিতৃদেব ছিলেন পারস্য সাহিত্যের ভক্ত। কখনো কখনো তাঁকে পারস্য কাব্য হতে বয়েৎ আবৃত্তি করতে শুনেছি। যেরূপ আনন্দোচ্ছ্বসিত কণ্ঠে আবৃত্তি করতেন, যথার্থ কাব্যরসিক ভিন্ন সেরূপ সম্ভব নয়। ফার্স্ট আর্টস্ পর্যন্ত পারস্য ভাষা ছিল তাঁর দ্বিতীয় ভাষা। সুতরাং শৈশবে ও বাল্যকালে নিম্নশ্রেণীতে যৎসামান্য বাংলা অথবা সংস্কৃত শিক্ষার বিশেষ সুযোগ পেয়েছিলেন ব'লে মনে হয় না। অথচ সংস্কৃত স্তব এবং পূজা-পাঠের মন্ত্রাদি এমন সুন্দরভাবে আবৃত্তি করতেন যে, সংস্কৃত ভাষার কিছু জ্ঞান না থাকলে তেমনভাবে করা কঠিন।

আমার পিতাঠাকুর অত্যন্ত ধার্মিক এবং সাত্ত্বিক প্রকৃতির মানুষ ছিলেন। পূজাপাঠ সন্ধ্যা-আহ্নিকে প্রতিদিন তিন ঘণ্টা সাড়ে তিন ঘণ্টা তাঁর অতিবাহিত হ'ত। আচার-বিচার এবং আহারাদিতে তিনি যৎপরোনাস্তি সংযমী ছিলেন। অতি প্রত্যুষে নিদ্রাভঙ্গের পর শয্যাগত অবস্থাতেই তিনি ব্রহ্মামুরারি ত্রিপুরান্তকারী প্রভৃতিকে স্মরণ ক'রে সুপ্রভাত মন্ত্র আবৃত্তি করতেন। শয্যা ত্যাগ করতেন নিম্নোক্ত মন্ত্রের দ্বারা আপন্নাশিনী দুর্গাকে স্মরণ ক'রে—

প্রভাতে যঃ স্মরেন্নিত্যং দুর্গাদুর্গাক্ষরদ্বয়ং।
আপদস্তস্য নশ্যন্তি তমো সূর্যোদয়ে যথা॥

এদিকে ততক্ষণে বাহিরেও সূর্যোদয়ের প্রভাবে তমোনাশ হ'ত।

পিতাঠাকুর সমস্ত দিনে মাত্র দুবার আহার করতেন—সন্ধ্যা-আহ্নিক পূজার্চনার পর আদালত যাত্রার পূর্বে একবার অন্ন; এবং সন্ধ্যাকালে আহ্নিক এবং জপাদির পর দ্বিতীয়বার দুধ এবং কিছু ফল

মিষ্টান্ন। যেটুকু খাদ্য দেবতাকে নিবেদিত ক'রে আহারে বসতেন, তদতিরিক্ত এক কণাও তাঁকে পরিবেশনের দ্বারা দেওয়া চলত না। চা ছিল তাঁর কাছে স্বপ্ন, কোকো স্বপ্নাতীত।

আমরা, সন্তান-সন্ততিরা, বাইরের আচার-বিচারে পিতৃদেবের সাত্ত্বিকতার কোনো অংশই আনতে পারি নি, কিন্তু অন্তরে যদি কিছু তার স্পর্শ এসে থাকে, তা হ'লে সেজন্য কৃতজ্ঞচিত্তে তাঁকে স্মরণ করি।

পূর্বে বলেছি, বংশগতিসূত্রে কারো কাছ থেকে যদি আমি সাহিত্য-প্রবণতা পেয়ে থাকি তো আমার মার কাছ থেকেই তা পেয়েছি; অথচ আমার মাতাঠাকুরাণী ছিলেন নিরক্ষরা।

আপাতবিরোধী এই দুটি উক্তিকে একসঙ্গে গ্রহণ করতে গেলে হয়তো একটু প্রহেলিকার মতো মনে হবে। কিন্তু আমার সন্দেহ নেই এ দুটি উক্তিই একই সঙ্গে সত্য। কোনো একটা বস্তুবিশেষ কোনো ভাবে প্রতীয়মান না হ'লেই যে তার অস্তিত্ব নেই, এমন কথা তো বলা চলে না। একটি স্থূল তামার তারচক্রের মধ্যে কোথাও যদি একটি বিজলী বাতি থাকে, তা হ'লে তারচক্রের ভিতর দিয়ে বিদ্যুৎতরঙ্গ প্রবাহিত হ'লেই বাতিটি ভাস্বর হয়ে উঠে ঐ চক্রের মধ্যে বিদ্যুৎতরঙ্গের অস্তিত্ব প্রতীয়মান করায়। কিন্তু বিজলী বাতির অভাবে চক্রটি সর্বতোভাবে অপ্রদীপ্ত থাকলেই যে তার মধ্যে বিদ্যুৎতরঙ্গ নেই, সে কথাও বলা চলে না।

আমার মাতৃদেবীর সাহিত্য-প্রতিভা অক্ষরবাহিনী ছিল না, ছিল শব্দবাহিনী। অক্ষরের উপর তাঁর প্রতিপত্তি ছিল না বটে, কিন্তু অক্ষরের সমষ্টির উপর প্রতিপত্তির অভাব ছিল না। মুখে মুখে তিনি কবিতা রচিত করতেন এবং নিজে সুগায়িকা ছিলেন ব'লে স্বরচিত কবিতা ও গানে এমন নিখুঁতভাবে সুর-যোজনা করতেন যে, তাদের পরিপূর্ণতার মধ্যে কবিতার ছন্দের সামান্য ভুল-চুক, ত্রুটি-বিচ্যুতি নিমজ্জিত হয়ে যেত।

আমাদের গৃহে বিশেষ কোনো ঘটনা অথবা বিশেষ কোনো অনুষ্ঠান—

যেমন জন্ম মৃত্যু বিবাহ ইত্যাদি, ঘটলে মা ঐ সকল বিষয় অবলম্বন ক'রে নিয়মিত কবিতা রচিত করতেন। এইরূপে বহু গান ও কবিতা তিনি রচিত করেছিলেন। অলসতাবশত যথাকালে সেগুলিকে খাতায় লিপিবদ্ধ না করায় তার অধিকাংশই বিস্মৃতির মহাসাগরতলে অদৃশ্য হয়েছে। যে কয়েকটি এখনো আত্মীয়-স্বজনের মনে মনে অথবা মুখে মুখে বেঁচে আছে, তন্মধ্যে একটি নিম্নে উদ্ধৃত করলাম। স্নেহলতা ( ডাকনাম নেতা ) নামে মাতাঠাকুরাণীর এক আদরের পৌত্রীর বিবাহ উপলক্ষে এই গানটি মা রচিত করেছিলেন। বলা বাহুল্য, গানটির সুর-সংযোগও করেছিলেন তিনি নিজেই। বিবাহরাত্রে ছাঁদনাতলায় কয়েকটি সুকণ্ঠী তরুণী কর্তৃক গীত হয়ে গানটি বিবাহ-উৎসবে অপরূপ মাধুর্যের অবতারণা করেছিল। গানটি এইরূপ—

চল সবে ধীরে ধীরে
গলায় প'রে ফুলের হার।
ছাঁদনাতলায় দাঁড়িয়ে আছে
দেখবে চল, নেতার বর।
চারিদিকে ফুলের বৃষ্টি,
করবে তারা শুভদৃষ্টি,
পরবে তারা গলায় ফুলের
বরণমালা অলঙ্কার।
বর কনে বাসরঘরে
বসবে গিয়ে আলো ক'রে,
পরেছে ফুলের বালা
মটুক টায়রা, কি বাহার।

[illegible] আর গানই বলি, এর মধ্যে ত্রুটি-বিচ্যুতি-

অসঙ্গতি যথেষ্ট আছে ; শেষের দুটি ছত্র কতকটা অসংলগ্ন এবং পৌনরুক্ত দোষে দুর্বল। কিন্তু এ কথা যদি ভুলে না যাই, এই গানের নিরক্ষরা রচয়িত্রীর ছন্দোবিজ্ঞানের সহিত কোনো পরিচয় ছিল না ; মাত্রা সম্বন্ধে তাঁর জ্ঞান রন্ধনের লবণ-ঝালের মাত্রাজ্ঞানের মধ্যেই সুপ্রকাশ ছিল এবং মনের চিন্তাকে কালি-কলমের সাহায্যে কাগজের উপর চিত্রায়িত ক'রে পরিমার্জনা অথবা সংশোধনের দ্বারা উন্নততর করবার সুযোগ তাঁর আদৌ ছিল না। তা হ'লে প্রতিভার অস্তিত্বে খানিকটা বিশ্বাস অবশ্যই করতে হয়।

শুধু কবিতা রচনাতেই নয়, কাহিনী রচনাতেও মাতাঠাকুরাণীর ক্ষমতার পরিচয় পেতাম। সন্ধ্যার পর তিনি তাঁর পৌত্র-পৌত্রীগণকে নিয়ে গল্প বলতে বসতেন। দিনের পর দিন গল্প চলে, অথচ একই গল্প বারংবার কথিত হতে বড় শোনা যায় না। বিস্মিত হয়ে ভাবি, এত গল্প মা শিখলেন কবে!

একদিন জিজ্ঞাসা করায় হাসিমুখে তিনি বলেছিলেন, "ব'লো না ওদের, শুনলে মন খারাপ হবে, সব বানিয়ে বানিয়ে বলি।"

বিস্মিত কণ্ঠে বলেছিলাম, "এত গল্প তুমি বানিয়ে বল মা?"

হাসিমুখে মা বলেছিলেন, "না বানিয়ে উপায় আছে কি? ওদের নিত্যি নতুন গল্প বলতে হবে। আমার জানা পুরনো গল্প শুনে শুনে ওদের অরুচি ধ'রে গেছে।"

ঔৎসুক্যসহকারে জিজ্ঞাসা করেছিলাম, "কিন্তু বানিয়ে বলছ জানলে ওদের মন খারাপ হবে কেন?"

মা উত্তর দিয়েছিলেন, "আমার বানানো শুনলে ওরা মনে ভাববে—গল্পটা আসলে মিথ্যে, কোনদিনই ঘটে নি। তাতে গল্পের মজা তেমন পায় না। অনেক পুরনো আমারও শোনা সেকেলে

গল্প শুনলে মনে করে, সে গল্প সত্যি সত্যিই হয়তো কোনদিন ঘটেছিল।"

এর পর মা যখন তাঁর পৌত্র-পৌত্রীদের নিয়ে গল্পে বসতেন, শুধু তাঁর পৌত্র-পৌত্রীরাই মুগ্ধ হয়ে শুনত না, সময় এবং সুযোগ পেলে পৌত্র-পৌত্রীদের পিতাঠাকুর মহাশয়ও আগ্রহসহকারে আড়াল থেকে কান খাড়া করতেন। গল্প অবশ্য সেই চিরন্তন রূপকথার কাহিনীর ভঙ্গিতেই; সুতরাং গল্পের উপাদানও সেই বেঙ্গমা-বেঙ্গমী, রাজপুত্র, কোটালপুত্র, সেই তেপান্তরের মাঠ, অতলতলে সোনার কৌটার মধ্যে সেই ভোমরা-ভোমরী, সেই দুয়োরাণী-সুয়োরাণী। কিন্তু বলবার গুণে, ঘটনাবিন্যাসের অভিনবত্বে হয়তো পুরনো গল্পই নূতন হয়ে উঠত। সময়ে সময়ে বুঝতে পারতাম, পুরনো গল্পের কাঠামোয় মা নূতন মৃত্তিকার সংযোজন করেন, কিন্তু তার আসল শ্রোতারা বিনা প্রতিবাদে নূতন গল্পই শুনত।

আমার মাতাঠাকুরাণী এক দিকে যেমন তীক্ষ্ণ বুদ্ধিশালিনী ছিলেন, অপর দিকে তেমনি ছিলেন কাজের মানুষ। কথায় কথায় তিনি বলতেন—'যার আছে কাজ সে সকালে সাজ'। তিনি অবশ্য সকাল সকালই সাজতেন, আমাদের কিন্তু অনেক সময়ে সাজতে-গুজতে দোল ফুরত। আমার মনে হয়, কর্মদক্ষতা গুণটি সব সময়ে বংশগতি স্বীকার ক'রে চলে না, মাঝে মাঝে এক-আধ পুরুষ নিদ্রাগত হয়ে শ্রান্তি অপনোদন করবার প্রয়োজনও তার হয়।

মাতাঠাকুরাণীর মধ্যে বুদ্ধিমত্তা এবং কর্মদক্ষতা দুটি গুণের মণিকাঞ্চন যোগ স্মরণ ক'রে আমরা মাঝে মাঝে বলতাম, "মা, তুমি যদি লেখাপড়া শিখতে তা হলে তুমি হতে প্রথম আশু মুখুজ্জে, আর আসল আশু মুখুজ্জে হতেন দ্বিতীয় আশু মুখুজ্জে।"

শুনে মা হাসতেন, কিছু বলতেন না।

তখনকার দিনে 'আশু মুখুজ্জে' কথাটি ছিল পাণ্ডিত্য জ্ঞান এবং কর্মদক্ষতা বিষয়ে উচ্চতম মূল্যমান।

মাকে নিরক্ষরা বলেছি ;—বস্তুত তিনি ছিলেনও হয়তো তা-ই। পণ্ডিতবংশের এক পণ্ডিতেরই দুহিতা অবশ্য তিনি ছিলেন। কিন্তু এ কথা যদি ভুলে না যাই যে, আজ হতে এক শত ছয়-সাত বৎসর পূর্বে আনুমানিক ১৮৪৫ খৃষ্টাব্দে তাঁর জন্মগ্রহণকালে বঙ্গদেশে, বিশেষত বঙ্গদেশের গ্রামাঞ্চলে, স্ত্রী-শিক্ষার প্রচলন এত অল্প ছিল যে, যে বালিকা দশ বৎসরের অধিককাল অনূঢ়া অবস্থায় পিত্রালয়ে বাস করবার অবসর পায় নি এবং দশমবর্ষীয়া বধূরূপে যাকে লজ্জাসঙ্কোচাকীর্ণ তদানীন্তন শ্বশুরগৃহে প্রবেশ ক'রে সংসারের দৈনন্দিন কর্মচক্রের সহিত যুক্ত হতে হয়েছিল, সময় এবং সুযোগের একান্ত অভাববশত তার পক্ষে বর্ণমালার অক্ষরগুলির পরিচয় না পাওয়া অসম্ভব ছিল না, তা হ'লে বিস্ময়ের বিশেষ কিছু থাকে না।

কদাচিৎ দেখা যেত, বর্ণমালার কয়েকটি অক্ষর ভুল অনুক্রমে বিবৃত ক'রে মাতাঠাকুরাণী তাঁর পৌত্র-পৌত্রীগণকে অপরিমিত মাত্রায় কৌতুকান্বিত করছেন। আসল রসের সঙ্গে পরিচয় থাকলে তবেই রসক্রিয়া করা সম্ভব হয়। সুতরাং এ কথাও মনে করা যেতে পারে, হয়তো মাতাঠাকুরাণী তাঁর পিতৃগৃহে সামান্য কিছু প্রাথমিক শিক্ষা পেয়েছিলেন। উত্তরকালে যখন তাঁর পুত্রগণ শিক্ষিত হয়ে উঠেছিল, তখন তাঁর সেই অল্পকায়া বিদ্যা সঙ্কোচে মূক হয়ে পুত্রগণের বিস্তৃততর বিদ্যার অন্তরালে হয়তো আত্মগোপন করেছিল।

শিক্ষা এবং জ্ঞান সব সময়ে সরল অনুপাতের বন্ধ [illegible] শীর্ণ শিক্ষার বৃন্তে অনেক সময়ে জ্ঞানের সুপুষ্ট ফল [illegible] মাতাঠাকুরাণীর ক্ষেত্রেও

তেমনি ফলত। শিক্ষার পরিচয় তাঁর বিশেষ কিছু না থাকলেও কথায়-বার্তায়, কাজে-কর্মে, বিচার-বিবেচনায় তিনি বলিষ্ঠ জ্ঞানের পরিচয় দিতেন। বহুসংখ্যক প্রবাদ এবং প্রবচন তাঁর জানা ছিল। কথোপ-কথনের মধ্যে তিনি সেগুলির এমন সুপ্রয়োগ করতেন, বেশ খানিকটা মননশীলতা ব্যতীত যেমন কিছুতেই সম্ভব হতে পারত না।

পৃথিবীর উপর দিয়ে যে সব পথের গতি, সে সকল পথ মাঝে মাঝে মোড় নিতে নিতে চলে। আমাদের জীবনের পথও সময়ে সময়ে মোড় নেয়—কখনো প্রখর মোড়, কখনো মোলায়েম; কখনো শুভায়, কখনো বা অশুভায়। সুদীর্ঘ বারো বৎসরের অনুসৃত ওকালতি ব্যবসায় পরিত্যাগ ক'রে যেদিন 'বিচিত্রা' মাসিক পত্রিকা প্রকাশে প্রবৃত্ত হয়েছিলাম, সেদিন আমার জীবনের পথ একটা প্রখর মোড়ই নিয়েছিল।

এই মোড়-নেওয়াটা আমার পক্ষে এবং আমার সংসারের পক্ষে দক্ষিণ দিকে হয়েছিল অথবা বাম দিকে—সে বিষয়ে মতভেদ ছিল। যাঁরা বস্তুপন্থী, তাঁদের মতে বাম দিকে নেওয়া হয়েছিল; আর যাঁরা বেহিসাবের এবং দুঃসাহসিকতার অনুরাগী, তাঁদের মতে দক্ষিণ দিকে। বলা বাহুল্য, শেষোক্ত মতবাদীর দল নিতান্তই শীর্ণ ছিল এবং আমি ছিলাম সে দলের দলপতি। কিন্তু সে যাই হোক, ব্যক্তিগত প্রসঙ্গের আলোচনা এখন স্থগিত রেখে 'বিচিত্রা'র সূত্রপাত কি ক'রে হয়েছিল, সেই কথাটাই প্রথমে বলি।

স্বদেশী-আন্দোলনের যুগে এক দল কর্মী ছিলেন, যাঁরা প্রকাশ্যে কাজ করতেন, বিদ্রোহ করতেন, দেশ জুড়ে বিপ্লবের মনোভাব গ'ড়ে তুলতেন এবং রাজরোষের দ্বারা দণ্ডিত হয়ে ফাঁসি, জেল এবং দ্বীপান্তরে যেতেন। অপর এক দল ছিলেন, যাঁরা নীরবে অন্তরালে অবস্থান ক'রে নানাভাবে প্রথমোক্ত দলকে সাহায্য করতেন। এই সাহায্যের সর্বপ্রধান এবং সর্বাপেক্ষা প্রয়োজনীয় সাহায্য ছিল অর্থ-সাহায্য। নির্যাতিতা এবং শৃঙ্খলিতা ভারত-জননীকে প্রবলপরাক্রান্ত ব্রিটিশ-রাজশক্তির হাত থেকে

উদ্ধার করবার সংকল্প নিয়ে যাঁরা কঠিন সংগ্রামে অবতীর্ণ হয়েছিলেন, তাঁদের লোকবলের প্রয়োজন ছিল নিশ্চয়ই; কিন্তু সেই লোকবলকে বাঁচিয়ে রাখবার এবং চালিয়ে যাবার জন্য অর্থবলের প্রয়োজন বোধ করি আরও বেশি ছিল। দরিদ্র ভারতবর্ষে দেশপ্রেমিকের অভাব ছিল না, ছিল অর্থের।

এই অর্থের অভাব যাঁরা সাধ্যমত পূরণ করতেন, তাঁদের অন্যতম ছিলেন পরলোকগত যোগীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়। যোগীন্দ্রনাথ ব্যবসায়ী ছিলেন; তাঁর ব্যবসায় ছিল প্রধানত কয়লা, চা এবং ঠিকাদারি কাজের। কারাগারে অবরুদ্ধ এবং দ্বীপান্তরিত দেশসেবকের দুঃস্থ আত্মীয়েরা তাঁর কাছে উপস্থিত হ'লে তিনি অকাতরে তাঁদের অর্থ-সাহায্য করতেন; এমন কি, ক্ষেত্রবিশেষে কোনো কোনো পরিবারে মাসহারাও দিতেন। কারামুক্ত এবং দ্বীপান্তর হতে প্রত্যাবৃত্ত ব্যক্তিদের উপার্জনের উপায় কোথাও না হ'লে সাধ্যমতো তিনি তাঁদের নিজের কারবারে ভর্তি ক'রে নিতেন।

যোগীন্দ্রনাথের মৃত্যুর পর দেশবরেণ্য নেতা শ্যামসুন্দর চক্রবর্তী 'সার্ভেণ্ট' নামক ইংরাজী দৈনিক সংবাদপত্রের প্রধান সম্পাদকীয় স্তম্ভে যোগীন্দ্রনাথের যে অকুণ্ঠিত প্রশস্তি-কীর্তন করেছিলেন, তা সত্যই [illegible] বস্তু। এই যোগীন্দ্রনাথ একদিন অভাবনীয়রূপে আমার জীবন-পথে আবির্ভূত হয়েছিলেন এবং মৃত্যুর কিছুদিন পূর্বে ইনিই 'বিচিত্রা'র সূত্রপাত ক'রে গিয়েছিলেন।

সে কথা বলবার আগে পূর্ব ইতিহাস একটু বলি। এই ইতিহাসের এক সময়ে যোগীন্দ্রনাথ এবং আমার মধ্যে এমন এক ঘটনা ঘটেছিল, যেমন ঘটনা, যত দূর আমার বিশ্বাস, বাংলা দেশে আর কখনো ঘটে নি; নিতান্তই যদি ঘটে থাকে তো কদাচিৎ কখনো।

১৩২৩ সালের ফাল্গুন মাস। ভাগলপুরে ওকালতি করি। হঠাৎ মহামারী আকারে প্লেগ দেখা দিলে। সেই সময়ে দু-চার বৎসর অন্তর ভাগলপুরে প্লেগ রোগ উৎপাত লাগাত। তখনকার দিনে প্লেগের অর্থ ই ছিল মৃত্যু। হাজার-করা একটা রোগী যদি আরোগ্য লাভ করত তো যথেষ্ট। সে আরোগ্য-লাভ মানুষের মনে আশ্বাসের সৃষ্টি না ক'রে সন্ত্রাসই জাগাত। সকলেই মনে মনে ভাবত, যদি ঐ কাল ব্যাধির কবলে আমি পড়ি, তা হ'লে কি আরোগ্য লাভের সুদুর্লভ সৌভাগ্য আমার ভাগ্যে জুটবে?

প্লেগের দু-তিন মাস যাবৎ সমস্ত ভাগলপুর শহর বিপন্ন বিষণ্ণ নেত্রে ভ্রূকুটিপাত ক'রে থাকে। খেয়ে সুখ নেই, প'রে সুখ নেই, হেসে সুখ নেই, এমন কি, কেঁদেও শান্তি নেই। জাগ্রত অবস্থায় রোগ ও মৃত্যুর বিভীষিকা, নিদ্রিত অবস্থায় গাল-গলা ফোলার স্বপ্ন। স্কুল-কলেজ দীর্ঘকালের জন্য বন্ধ হয়ে যায়; আপিস-আদালত বেলা তিনটে বাজতে না বাজতেই শুনশান। মোকদ্দমায় সাক্ষী হাজির হয় না, হাকিমরা লম্বা লম্বা তারিখ দিয়ে উৎকণ্ঠিতচিত্তে বাড়ি পালান। সন্ধ্যা হতে না হতে পথ-ঘাট জনহীন হয়ে যায়। শুধু পথের দু ধারের আতঙ্কস্তব্ধ গৃহগুলোকে চকিত ক'রে মাঝে মাঝে ধ্বনিত হয় 'রাম নাম সৎ হ্যায়', কখনো বা 'বল হরি হরিবোল'। ইঁদুর দেখলে, মৃত্যুর দূত মনে ক'রে লোকে আঁতকে উঠে দশ হাত স'রে যায়,—তা সে ইঁদুর মরাই হোক আর জীবন্তই হোক। সকলের শরীর সর্বদা কেমন ম্যাজ্‌ম্যাজ করে। যারা একটু ভীতু, তারা গলায় এবং অন্যান্য স্থানের গ্রন্থিতে বেদনা বোধ করে। অবশ্য রোগের বেদনা নয়, ভয়ের।

আমাদের দিকটা অপেক্ষাকৃত ভাল ছিল। কিন্তু হঠাৎ একদিন আমাদের গৃহ থেকে মাত্র আধ মাইল-টাক দূরবর্তী মায়াগঞ্জে প্লেগ দেখা

দিলে। মায়াগঞ্জ পূর্ব-ভাগলপুরের সর্বপ্রধান প্লেগ-ডিপো। অবস্থাপন্ন বাঙালীরা শহর ছেড়ে দূরে গিয়ে বাস করতে আরম্ভ করলে।

আমিও আর মায়াগঞ্জের অত কাছে অবস্থান করা সমীচীন মনে করলাম না। পার্শ্ববর্তী মোমিনটুলিতে কবে স্ফুলিঙ্গ উড়ে এসে আগুন ধরিয়ে দেয়, কে বলতে পারে! বৈশাখ মাসে কলকাতায় একটা প্রয়োজনও ছিল, একদিন সপরিবারে কলিকাতাগামী প্যাসেঞ্জার ট্রেনে উঠে বসলাম।

ওয়েলিংটন স্ট্রীট ও হিদারাম বাঁড়ুজ্জে লেনের মোড়ের নিকট দ্বিতলের বাসা ভাড়া নিয়ে আমরা কলকাতায় বাস করতে লাগলাম। সামনেই সন্দেশ-রসগোল্লার সুদীর্ঘ সারিবদ্ধ পণ্যবীথি। মধ্যস্থলে বহু-বিখ্যাত মিষ্টান্ন-বিক্রেতা ভীমচন্দ্র নাগের দোকান।

রাত্রি নটা-দশটার সময়ে বড় বড় খোলায় সন্দেশের ভিয়ান চড়ে। কাঠের বৃহৎ তাড়ুর আলোড়নের দ্বারা ছানা এবং দোবরা চিনি একসঙ্গে পাক হতে থাকে এবং সেই আলোড়নের ফলে উত্তপ্ত ছানা-শর্করা হতে নির্গত মৃদু সুমিষ্ট সৌরভ প্রশস্ত রাজপথ অতিক্রম ক'রে আমাদের বাসায় উপস্থিত হয়ে মনের মধ্যে লোভের উৎপাত লাগায়। সদ্য-প্রস্তুত ঈষদুষ্ণ সন্দেশের আস্বাদের বিশেষ যে মজা একমাত্র সেই জানে, যে কখনো উৎকৃষ্ট ময়রার দোকানের সামনে বাসা বেঁধে বাস করেছে।

আশুতোষ মুখোপাধ্যায় তখন কলিকাতা হাইকোর্টের বিচারপতি এবং কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের হর্তা-কর্তা-বিধাতা। শুনেছিলাম, উৎকৃষ্ট সন্দেশ তাঁর অতিশয় প্রিয় বস্তু ছিল, এবং সন্দেশ খেতেন গণ্ডার হিসাবে। এ কথা শোনাই ছিল, কিন্তু ওয়েলিংটন স্ট্রীটের বাড়ির বারান্দা থেকে তার চাক্ষুষ পরিচয় পেতে লাগলাম। হাইকোর্টের ছুটির পর আশুতোষ প্রায়ই ইউনিভার্সিটিতে যেতেন এবং সেখানকার কাজ শেষ ক'রে কিছুক্ষণ পরে ফিরতেন।

গৃহ প্রত্যাগমনের মুখে তাঁর গাড়ি এসে দাঁড়াত ভীম নাগের সন্দেশের দোকানের সম্মুখে। ক্রেতা অথবা বিক্রেতা কোনো পক্ষ থেকেই কোনো উপদেশ দেবার অথবা পাবার বিশেষ প্রয়োজন দেখা যেত না,—

আশুতোষের গাড়ি দেখলেই দোকানদারেরা দুটি ঠোঙা প্রস্তুত করতে আরম্ভ করতেন—একটি বড় ঠোঙা বাড়ির জন্যে, আর গাড়ি জন্যে একটি ছোট। বড় ঠোঙাটি অক্ষত অস্পৃষ্ট অবস্থায় গৃহে প্রবেশ ক'রে আত্মীয়বর্গের ভোগে আসত; ছোটটির ব্যবহারের হ'ত গাড়িতেই। ছোটটির ব্যবহারের রহস্য দোকানদারদের অবিদিত ছিল না,—তাঁরা তাড়াতাড়ি সর্বাগ্রে ছোট ঠোঙাটি প্রস্তুত ক'রে আশুতোষের হাতে ধ'রে দিতেন আর সঙ্গে সঙ্গে আরম্ভ হয়ে যেত—টপাটপ। গাড়ি ছাড়বার আগেই হয়তো গোটা চার-পাঁচ সন্দেশ ঠোঙা থেকে স্থানান্তরে উপনীত হ'ত।

আমাদের কলিকাতা বাসের দিন পনের-ষোল পরে একদিন আমার মাতাঠাকুরাণী আমাকে বললেন, "কাল সকালে তুমি বাড়ি থেকো, কোথাও বেরিয়ো না, একটি ভদ্রলোক মলুকে দেখতে আসবেন।"

মলু অর্থাৎ আমার সাড়ে দশ বৎসর বয়স্কা কন্যা মলিনা।

মা'র কথা শুনে বিস্মিত কণ্ঠে জিজ্ঞাসা করলাম, "মলুকে একটি ভদ্রলোক দেখতে আসবেন? কেন, কিসের জন্যে দেখতে আসবেন?"

আমার প্রশ্ন এবং কণ্ঠস্বরের ভঙ্গিতে মাতাঠাকুরাণী একটু ভড়কে গেলেন, মৃদু-স্মিত মুখে বললেন, "মলুর বিয়ের একটি সম্বন্ধ করছি। ছেলের বাপ দেখতে আসবেন।"

"এ সম্বন্ধ কাকে দিয়ে করালে?"

"হরিপ্রভাসকে দিয়ে।"

কয়েকদিন ধ'রে হরিপ্রভাস এবং মাতাঠাকুরাণীর মধ্যে গুজগুজ ক'রে গোপন পরামর্শ চলছিল, আমার উপস্থিত মাত্রই যা বন্ধ হয়ে যেত। এখন তার মর্ম উপলব্ধি করলাম। কপট-নির্লিপ্ত কণ্ঠে বললাম, "ঠাকুরমা আর আমায় মিলে মলুর বিয়ে দিচ্ছ, আমার কি আপত্তি থাকতে পারে? বিয়ের রাত্রে নেমন্তন্ন ক'রো, পেট ভ'রে লুচি মণ্ডা খাওয়া

যাবে। কিন্তু এই অকাজের মধ্যে আমি কোনো অংশ গ্রহণ করব না। কাল সকলে কখন ছেলের বাপ আসবেন?"

"আটটা সাড়ে আটটার সময়ে।"

বললাম, "কাল সে সময়ে আমি কালীঘাটে ক্ষুদিরাম হালদার পাণ্ডার সঙ্গে কথাবার্তায় ব্যস্ত থাকব। পুলিন তো বাড়ি থাকবে, তাকে দিয়ে কথাবার্তা চালিয়ো।"

পুলিন আমার ভ্রাতুষ্পুত্র, হার্ডিঞ্জ হস্টেলে থেকে সে এম. এ. ও ল পড়ে; আমরা ওয়েলিংটন স্ট্রীট বাসা নেওয়ার পর থেকে সে আমাদের কাছে এসে আছে।

আমাকে এ কার্যে প্রবৃত্ত করাবার জন্য মাতাঠাকুরাণী একটু চেষ্টা-চরিত্র করলেন; আমি কিন্তু এমন অসম্ভব ব্যাপারে কিছুতেই সম্মত হতে পারলাম না; বললাম, "আচ্ছা মা, এ কথার কি কোনো অর্থ থাকতে পারে? প্লেগের ভয়ে কলকাতায় পালিয়ে এসে ব'সে আছি; উপার্জন বন্ধ; কবে ফিরে যেতে পারব, তার প্রত্যাশায় ভাগলপুরের পথের দিকে চেয়ে আছি; এর মধ্যে, কোনো দরকার নেই, প্রয়োজন নেই, সাড়ে দশ বছরের মেয়ের বিয়ে?"

মা আর কিছু বললেন না; বোধ হয় দুঃখিত হয়েই চুপ ক'রে গেলেন।

ক্ষণকাল পরে আমার স্ত্রী মাতাঠাকুরাণীর সপক্ষে ওকালতনামা নিয়ে আমার নিকট হাজির হলেন। কিন্তু উকিলের স্ত্রী হ'লে কি হবে? যুক্তি-তর্কে আসল উকিলের নিকট পরাজিত হয়ে রণে ভঙ্গ দিলেন।

পরদিন সকালে উঠে ভাবলাম, কি করা যায়? পুলিন মুখচোরা ছেলে, ভালমানুষ,—তার উপর একটা অপ্রিয় কঠিন কার্যের ভার দিয়ে স'রে পড়া ঠিক সমীচীন হয় না। স্থির করলাম, বিয়ে যখন নিশ্চয়ই দেব না, তখন ভদ্রলোককে গাড়িতেই আটকাতে হবে। পায়দানে পা

ফেলবার আগে তাড়াতাড়ি উপস্থিত হয়ে হাতজোড় করব: আসবার আগে আমাকে যদি একবার জানাতেন, তা হ'লে এ কষ্টটুকু করতে হ'ত না; মেয়ের বিয়ে যখন উপস্থিত বেশ কিছুদিন দিচ্ছি নে, তখন সে বিষয়ে আপনাদের আর অধিক কষ্ট দিই কেন?

বাড়িতেই অপেক্ষা ক'রে রইলাম। পুলিনকে বললাম, "একটু নজর রেখো,—ঐ ধরনের সন্দেহজনক গাড়ি কিংবা লোক দেখলেই আমাকে খবর দিয়ো।"

আটটার মিনিট দশেক পরেই পুলিন তাড়াতাড়ি এসে খবর দিলে, "কাকা, মনে হচ্ছে ওঁরা এসেছেন।"

জানলার কাছে গিয়ে দেখি, আমাদের বাড়ির সামনে একঘোড়ার একটা বাড়ির কম্পাস গাড়ি দাঁড়িয়েছে। একজন আরোহী পথে অবতরণ করেছেন; একজন পায়দানে পা ফেলতে উদ্যত; আর, আর-একজন মাথা নীচু ক'রে গাড়ির মধ্যে উঠে দাঁড়িয়েছেন। দ্রুতপদে সিঁড়ি ভেঙে নীচে নেমে গিয়ে তাড়াতাড়ি দরজা খুলে দেখি, তিন জনেই ততক্ষণে দরজার সামনে হাজির, শুধু কড়া নাড়তে বাকি।

এখন, এ অবস্থায় মাত্র দুটি কাজ করা যেতে পারে;—হয় পিছু হ'টে ভদ্রলোকদের সম্মুখে পা বাড়াবার জায়গা ক'রে দেওয়া, না-হয় হাত জোড় করা। গাড়িতে গিয়ে আটকাতে পারলে অবশ্য স্বতন্ত্র কথা ছিল; বাড়ির দরজা থেকে ফিরিয়ে দিতে কুণ্ঠা বোধ করলাম।

ভদ্রলোকদের মধ্যে একজন জিজ্ঞাসা করলেন, "আপনি?"

বললাম, "আমি উপেন গাঙ্গুলী।"

ভদ্রলোক বললেন, "ও! নমস্কার। আমি যোগীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়। আমারই ছেলে।"

যুক্তকরে বললাম, "নমস্কার, আসুন।" মনকে প্রবোধ দিলাম, বিয়ে

যখন কিছুতেই দিচ্ছি নে, তখন মেয়ে দেখাচ্ছি নেও নিশ্চয়ই। উপরে নিয়ে গিয়ে বসিয়ে যথোচিত ভদ্রতার সঙ্গে কথাটা প্রকাশ ক'রে বললেই হবে।

দ্বিতলে গিয়ে ভদ্রলোকদের বাইরের ঘরে বসলাম। আমার প্রতি দৃষ্টিপাত ক'রে যোগীনবাবু বললেন, "আপনারই তো মেয়ে?

বললাম, "আজ্ঞে হ্যাঁ।"

যোগীনবাবু বললেন, "আপনি তো ছেলেমানুষ।"

সে বিষয়ে মতভেদের যথেষ্ট অবকাশ ছিল; কিন্তু প্রশ্ন যখন করেন নি শুধু মন্তব্য করেছেন, চুপ ক'রেই রইলাম। ছেলেমানুষকে দেখতে এসে ছেলেমানুষের বাপকেও যদি ছেলেমানুষ বলেন, সে ক্ষেত্রে তর্ক না তোলাই ভাল।

"কতদিন ওকালতি করছেন?"

"বছর চারেক।"

"মাত্র? ওকালতির পক্ষে বছর চারেক তো কিছুই নয়। দেখুন, আমার এইটি বড় ছেলে,—একটি সুন্দরী পাত্রী খুঁজছি। অনেক পাত্রী দেখেছি, কিন্তু বাংলা দেশে সুন্দরী পাত্রী পাওয়া অতিশয় কঠিন। শুনেছি, আপনার কন্যা পরমাসুন্দরী। যদি আমার পছন্দ হয়, তা হ'লে শুধু আপনার মেয়েটিকে নোব, আর কিছুই নোব না।"

কোনো উত্তর দিলাম না, নিঃশব্দে যোগীনবাবুর দিকে চেয়ে রইলাম। কোন্ ভাষায় 'মেয়ে দেখাব না' বলব—মনে মনে তার মজবুন ভাঁজতে লাগলাম।

ইত্যবসরে যোগীনবাবু ব'লে চলেছেন, "আমার বৃহৎ পরিবার, অনেকগুলি ছেলেমেয়ে; কি-ই বা এমন আপনি আমাকে দেবেন যাতে আমার অবস্থার পরিবর্তন ঘটবে? পীড়ন করলে হয়তো চার-পাঁচ হাজার টাকা

আদায় করা যায়। কিন্তু তাতে আমার জাতও যাবে, পেটও ভরবে না।” ব’লে হেসে উঠলেন।

‘তাতে আমার ছুঁচো মেরে হাতে গন্ধ করা হবে’ বলেন নি ব’লে মনে মনে ভদ্রলোককে ধন্যবাদ দিলাম।

যোগীনবাবু ব’লে চললেন, “নগদ তো এক পয়সা নোব না; জিনিসপত্র শুধু এমন দেবেন, যাতে আপনার একটুও কষ্ট না হয়। আত্মীয়তা স্থাপন করতে গিয়ে যদি আপনার কষ্টের কারণই হলাম, তা হ’লে তো সে আত্মীয়তার গোড়ায় গলদ র’য়ে গেল।”

না! লোকটা না-উঠিয়ে ছাড়লে না দেখছি! দিই মেয়ে দেখিয়ে, তার পর বিয়ে দেওয়া-না-দেওয়া তো নিজ এক্তারের ব্যাপার। ‘অনুগ্রহ ক’রে ক্ষমা করবেন’ ব’লে একখানা পোস্টকার্ড ঝেড়ে দিলেই হবে।

মুখখানা বিরক্তি-বিরূপ ক’রে নিয়ে বাড়ির ভিতর প্রবেশ ক’রে দেখি, স্নান ক’রে একখানা সাদা আটপৌরে কালাপাড় শাড়ি প’রে মলু রৌদ্রে দাঁড়িয়ে চুল শুকোচ্ছে। মুখ তৈলনিষিক্ত, কেশ এলায়িত। একখানা হাত ধ’রে অল্প টান দিয়ে বললাম, “চল্, দেখিয়ে দিই।”

নিকটেই ছিলেন স্ত্রী। খপ ক’রে মলুর আর একখানা হাত ধ’রে ফেলে বললেন, “দেখাবে নাকি?”

যথাসম্ভব মুখ গম্ভীর ক’রে বললাম, “তোমাদের পাল্লায় যখন পড়েছি, তখন তো রক্ষে নেই!”

স্ত্রী বললেন, “তা হ’লে চট্ ক’রে একটু পরিষ্কার ক’রে দিই।”

বিরক্তিতিক্ত কণ্ঠে বললাম, “আর পরিষ্কার করতে হবে না। পছন্দ না করলে একটুও দুঃখিত হব না।”

বাইরের ঘরে এসে মেয়েকে বসিয়ে দিলাম। দেখতে দেখতে যোগীনবাবুর মুখ উজ্জ্বল হয়ে উঠল। বললেন, “অনেক মেয়ে দেখেছি, কিন্তু এমন

সুন্দরী আর সুলক্ষণা মেয়ে একটিও দেখি নি। ইচ্ছে করছে, এখনই মাকে ঘরে নিয়ে যাই।"

একটু পরে বললেন, "আচ্ছা মা, তুমি এস; তোমাকে আর কষ্ট দোব না। শীঘ্রই তোমাকে নিয়ে যাচ্ছি।"

মলু ভিতরে গেলে আমাকে বললেন, "আমি সম্পূর্ণ রাজী। যে ঘরে আমরা মেয়ে দিয়েছি, সেই ঘরের মেয়েকে আপনি বিয়ে করেছেন, সুতরাং ঘর দেখবার দরকার নেই। মেয়ের স্বাস্থ্য সৌন্দর্য সবই স্বচক্ষে দেখলাম। এখন আমার ছেলেকে আপনি পছন্দ করলেই বিয়ে হয়ে যায়।"

একটু চুপ ক'রে থেকে বললেন, "যদি আপনি সম্মত হন, তা হ'লে যা বলেছি তা অক্ষরে অক্ষরে পালন করতে হবে। একটি পয়সা আমি নোব না, আর এ বিষয়ে আমি ছাড়া আর কারো সঙ্গে আপনি কথা কইবেন না। এমন কি, যদি আমার বাড়ি থেকে কেউ এসে বলে, 'আপনারা যা গয়না দেবেন তার শুধু একটা লিস্ট্ দিন, যাতে আমাদের দেয় গয়নার সঙ্গে কোনটা এক না হয়ে যায়,' তা হ'লেও তার সঙ্গে কোনো কথা কইতে অস্বীকার যাবেন। এ বিষয়ে আপনি আর আমি ছাড়া তৃতীয় ব্যক্তি কেউ থাকবে না।"

আমি শুনছিলাম আর ভাবছিলাম, এ ব্যক্তিটি হয় অধুনাদুর্লভ ভদ্রশ্রেণীর অতি উচ্চে অবস্থিত সাধুপুরুষ, নয়, কলকাতার একেবারে পয়লা নম্বর। দু-চার দিন নাড়াচাড়া ক'রেই বুঝতে পারলাম, পয়লা নম্বর নয়,—সাধুপুরুষ।

যে-আমি তরুণকাল হতে বাল্যবিবাহ-প্রথার ঘোর বিরোধী, যে-আমি সাড়ে দশ বৎসরে কন্যার বিবাহ দোব না ব'লে বদ্ধপরিকর হয়েছিলাম, সেই-আমি পাত্র দেখার পূর্বেই, শুধু পাত্রের পিতাকে দেখে, বিবাহে সম্মতি প্রদান করলাম। পাত্র সুশীলকুমার তখন পরীক্ষার পর দার্জিলিং বেড়াতে গিয়েছেন। মনে মনে হিসাব করলাম, 'বাপকা বেটা সিপাহিকা

ঘোড়া, কুছ নহি তো থোড়া থোড়া।' অদূরভবিষ্যৎ প্রতিপন্ন করেছিল, আমার হিসাবে কিছুমাত্র ভুল হয় নি।

বিবাহ হয়ে গেল ;—কিন্তু সে ক্ষেপে নয়, ভাগলপুর থেকে একবার ফিরে এসে আষাঢ় মাসে।

বরপক্ষে বউভাতের প্রীতিভোজ দু দিন হয়েছিল—অগ্রে একদিন মহিলাগণের, পরে পুরুষদের। মহিলা-ভোজের দিন নিমন্ত্রণ সেরে ফিরে এসে মাতাঠাকুরাণী আমাকে বললেন, "দেখ, বরের বাড়িতে একটি বৃদ্ধা বিধবা স্ত্রীলোক আমাকে বলছিলেন, 'যোগীন তো যথেষ্ট ভদ্রতা করেছে, একটি পয়সা নেয় নি ; কিন্তু কুলীনের মর্যাদা ব'লে আপনাদের যা-হয় কিছু দেওয়া উচিত ছিল'।"

বিস্মিত এবং একটু ক্ষুব্ধও হলাম। বললাম, "আচ্ছা মা, এর যা-হয় কিছু ব্যবস্থা করা যাবে।"

হাতে অর্থ ক'মে এসেছিল। পুরুষদের নিমন্ত্রণের দিন পকেটে পাঁচখানা নোটে পাঁচ শো টাকা নিয়ে কন্যার শ্বশুরগৃহে উপস্থিত হলাম।

আমাকে দেখে প্রসন্নমুখে যোগীনবাবু বললেন, "আসুন বেয়াই মশায়, আমরা দুই ভাই মিলে দেখাশুনো ক'রে সকলকে খাওয়াই। সকলের খাওয়া শেষ হয়ে গেলে তার পর আমরা বসব।"

বললাম, "অতি উত্তম প্রস্তাব।"

পাশাপাশি গোটা দুই ছাতে খাওয়ানো হচ্ছিল, আমরা দুজনে ঘুরে ঘুরে দেখাশুনো করতে লাগলাম। তিন-চার খেপে অভ্যাগতদের খাওয়া শেষ হতে রাত্রি এগারোটা বেজে গেল। তখন আর আমাদের উপরে থাকবার প্রয়োজন ছিল না, নীচে নেমে উভয়ে বৈঠকখানায় প্রবেশ করলাম। আসন গ্রহণ করবার পূর্বে নিম্নকণ্ঠে যোগীন্দ্রবাবুকে বললাম, "বেয়াই মশায়, একটা কথা আছে।"

সকৌতূহলে যোগীন্দ্রনাথ বললেন "কি বলুন তো ?"

"একটু আড়ালে যদি আসেন।"

সর্বত্রই কিছু-না-কিছু লোক আছে। অগত্যা যোগীন্দ্রনাথ আমাকে নিয়ে বাইরে রাজপথে এসে দাঁড়ালেন। রাজপথে, অর্থাৎ পটলডাঙা স্ট্রীটের স্বর্গীয় হরপ্রসাদ শাস্ত্রী মহাশয়ের গৃহ হতে সোজা পূর্ব দিকে খানিকটা গিয়ে পথটা যেখানে খাড়া দক্ষিণ দিকে মোড় নিয়েছে, সেই বাঁকের মাথায়।

যোগীন্দ্রনাথ বুঝতে পেরেছিলেন, কথাটা নিতান্ত সাধারণ নয়; ব্যগ্রকণ্ঠে জিজ্ঞাসা করলেন, "কি কথা বলুন তো ?"

বললাম, "আপনার উদারতায় সহৃদয়তায় মুগ্ধ হয়ে আছি,—আপনি অবশ্য স্পষ্টবাক্যে বলেছিলেন, আমার কাছ থেকে একটি পয়সাও নগদ নেবেন না, তবু আমার কিন্তু উচিত ছিল কৌলীন্যের মর্যাদাস্বরূপ কিছু টাকা আপনাকে দেওয়া। আজ সামান্য পাঁচ শো টাকা নিয়ে এসেছি,—অনুগ্রহ ক'রে গ্রহণ করলে সত্যিই খুশি হব।" ব'লে পকেট থেকে পাঁচখানা নোটের একটা মোড়া বার করলাম।

এক মুহূর্ত যোগীন্দ্রনাথ পাথরের মতো স্তব্ধ হয়ে দাঁড়িয়ে রইলেন; তার পর গভীর-দৃপ্ত কণ্ঠে বললেন, "আপনার কাছ থেকে নগদ নোব না, তা আপনার প্রতি দয়াপরবশ হয়ে বলি নি; অন্ প্রিন্সিপ্‌ল নোব না ব'লেই বলেছিলাম। আপনি যদি বিয়ের রাত্রে এ টাকা দিতে আসতেন, বর তুলে নিয়ে চ'লে আসতাম।" এক মুহূর্ত নিঃশব্দে অবস্থান ক'রে বললেন, "বুঝেছি, কার দ্বারা এ মিস্‌চিফ হয়েছে। আমার স্ত্রী এ কথার একটু আভাস আমার কানে একবার দিয়েছিলেন। নিতান্ত কাজের বাড়ি ব'লে এ পর্যন্ত সে কথায় কোনো ব্যবস্থা করি নি।"

তার পর, বলা নেই কওয়া নেই, টপ ক'রে পথের উপর উবু হয়ে ব'সে

প'ড়ে দু হাতে আমার দু পা চেপে ধ'রে আর্তনেত্রে আমার প্রাত দৃষ্টিপাত ক'রে বললেন, "বেয়াই মশায়, আমাকে ক্ষমা করুন। অযথা আপনার মনে কষ্ট দেওয়া হয়েছে।"

শশব্যস্ত হয়ে আমি সঙ্গে সঙ্গে ব'সে প'ড়ে আমার পা থেকে যোগীন্দ্র-নাথের হাত ছাড়িয়ে নিয়ে বললাম, "ছি ছি, বেয়াই মশায়, এ কাজ ক'রে কেন এমনভাবে আমাকে শাস্তি দিলেন? আমি তো আপনার কাছে কোনো অপরাধ করি নি!"

কিন্তু সে আমি যাই বলি আর যাই করি না কেন, যোগীন্দ্র মুখোপাধ্যায়ের সহিত পাল্লা দেওয়া সহজ ব্যাপার নয়, সে কথা সম্পূর্ণরূপে উপলব্ধি ক'রে সেদিন গৃহে ফিরেছিলাম। বরের পিতা হয়ে কন্যার পিতার পা ধ'রে তিনি আমাকে সেদিন যে পরাজয়ে পরাজিত করেছিলেন, বর-পিতাশাসিত বাংলা দেশে তা একান্তই যদি অভূতপূর্ব না হয়, একান্তভাবে বিরল, সে বিষয়ে সন্দেহ নেই।

এই ধরনের মানুষ ছিলেন যোগীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়।

গাছে পাতা ধরে, ফুল ফোটে; সকলে মনে করে, আকাশের রৌদ্র-বৃষ্টিই তার কারণ। কিন্তু অন্তরালের সংবাদ যে দু-চারজন রাখে তারা জানে, মূল কারণ মাটির নীচেই অগোচরে আছে।

'বিচিত্রা' মাসিক-পত্রিকা যখন প্রকাশিত হ'ল, তখন যোগীন্দ্রনাথ তাঁর কর্মময় জীবন পরিত্যাগ ক'রে পরলোকগত হয়েছেন। সকলে মনে করলে, যারা কাগজ প্রকাশ করলে, সম্পাদন করলে, তারাই 'বিচিত্রা'র আদি এবং প্রথম কারণ। কিন্তু মৃত্যুর পূর্বে যোগীন্দ্রনাথ, শুধু দু-চার জনের গোচরে, 'বিচিত্রা'র মূল কারণ নিহিত ক'রে গিয়েছিলেন।

সেই কথা এবার বলি।

মানুষের আয়-পয় সংক্রান্ত একটা বিশ্বাস সাধারণের মধ্যে প্রচলিত আছে। কোনো নূতন লোক সংসারে প্রবেশের সঙ্গে সঙ্গে সংসার যদি সৌভাগ্যে ও সম্পাদে সমৃদ্ধ হয়ে ওঠে, তা হ'লে নবাগত অথবা নবাগতাকে পয়মন্ত ব'লে বিবেচিত করা হয়। পক্ষান্তরে, প্রবেশের সঙ্গে সঙ্গে বিপরীত লক্ষণ প্রকাশ পেতে থাকলে তাদের বলা হয় অপয়া। এই পয়া ও অপয়া শব্দ দুটি নবাগতা বধূর সম্পর্কেই বিশেষভাবে লক্ষিত ও প্রযুক্ত হয়।

শুধু মানুষের ক্ষেত্রেই নয়, গৃহপালিত পশুপক্ষী, এমন কি, বৃক্ষলতার ক্ষেত্রেও, এই পয়া-অপয়া শব্দ দুটি প্রতীত এবং প্রযুক্ত হয়। নারিকেল বৃক্ষে প্রথম ফল ধরার সঙ্গে সঙ্গে সংসারে যদি একাধিক মৃত্যু, বিশেষত অকাল মৃত্যু অথবা অন্য কোনোপ্রকার দুর্ঘটনা ঘটে, তা হ'লে সাধারণ বিচারবুদ্ধিসম্পন্ন মানুষকেও সেই অপয়া নারিকেল গাছের মূলোচ্ছেদ ক'রে ফেলে তার অশুভ প্রভাব থেকে রক্ষা পেতে দেখা যায়।

এ বিশ্বাসের মূলে সত্য সত্যই কোনো সত্য আছে অথবা নেই, সে তর্ক তুলছি নে। দীর্ঘকাল যাবৎ যে অগণ্য ঘটনা চোখে পড়ার ফলে এই বিশ্বাস উৎপন্ন হয়েছে, আমার বিশ্বাস, সে সমস্ত ঘটনাই কাকতালীয় শ্রেণীর ঘটনা।

কিন্তু সে যাই হোক না কেন, পয়া-অপয়ার কথা আমি বিশ্বাস করি আর না-ই করি, বিশ্বাস করতেন যোগীন্দ্রনাথ—অন্তত তাঁর পুত্রবধূ মলিনার সম্পর্কে। পুত্রের বিবাহের অব্যবহিত পরেই তাঁর সংসারের সৌভাগ্যের রথচক্রে যে ত্বরিত গতিবৃদ্ধি দেখা গিয়েছিল, মনে প্রাণে

তিনি বিশ্বাস করতেন তা একমাত্র তাঁর আদরের পুত্রবধূর কল্যাণে। স্নেহাধিক্যের প্রভাবে তিনি তাঁর প্রবল কর্মশক্তিকে বেশ খানিকটা বিস্মৃত হতেন।

এ কথা তিনি সর্বসমক্ষে মুক্তকণ্ঠে ব্যক্ত ক'রে আনন্দলাভ করতেন। একবার এক পারিবারিক বৈঠকে আমার দাদাকে বলেছিলেন, "বড় বেয়াই মশায়, যে মেয়ে সংসারে প্রবেশ করার পর সংসারের আয়-পয় বেড়ে যায়, ধূলোমুঠো ধরলে সোনামুঠো হয়, সে মেয়ের ভারি খাতির। আমাদের সংসারে আপনার ভাইঝির ভারি খাতির।"

আমার কন্যার বিবাহের পর যোগীন্দ্রনাথ সাড়ে আট বৎসর জীবিত ছিলেন। এই সাড়ে আট বৎসরের মধ্যে তাঁর আথিক সঙ্গতি অন্তত চতুর্দশ গুণ বৃদ্ধিলাভ করেছিল। এ প্রকাশ পেয়েছিল তাঁর মৃত্যুর পর তাঁর পুত্রগণ কর্তৃক সাক্‌সেশন সার্টিফিকেটের (Succession Certificate ) জন্য যে দরখাস্ত করা হয়েছিল, তার সংলগ্ন সম্পত্তির তালিকা ও মূল্য-নিরূপণ থেকে।

১৯২৫ সালের মাঝামাঝি। কার্যোপলক্ষে দু-চার দিনের জন্য ভাগলপুর থেকে কলিকাতায় এসেছি। যোগীন্দ্রনাথের ব্যবসায়-বাণিজ্য কার-কারবার তখন উন্নতির উল্লসিত ছন্দে চলেছে। যে দিকে তিনি বাতি জ্বালান, সেই দিকই উজ্জ্বল হয়ে ওঠে।

একদিন তাঁর সঙ্গে দেখা করতে গেছি। কথায় কথায় তিনি বললেন, "বেয়াই মশায়, অবাঙালীর দেশে অত দূরে অবস্থান ক'রে আপনার সঙ্গ থেকে আমাদের বঞ্চিত করছেন। কলকাতায় এসে ব্যবসা আরম্ভ করুন।"

বললাম, "কি ব্যবসা? ওকালতি?"

মাথা নেড়ে যোগীন্দ্রনাথ বললেন, "না না, ওকালতি কেন?—ওকালতি তো করছেনই সেখানে। অন্য ব্যবসার কথা বলছি।"

ব্যবসায়ের ক্ষেত্রে যোগীন্দ্রনাথ সফল মানুষ, ব্যবসায়ের গূঢ় তত্ত্ব তাঁর কাছে ধরা দিয়েছে, তিনি তো সহজেই ব্যবসায়ের কথা বলবেন! কিন্তু তাঁর হাতের যে জাল জলের মাছকে ডাঙায় টেনে নিয়ে আসে, আমার হাতে সেই জাল ডাঙার মানুষকে জলে টেনে নিয়ে গিয়ে না ডোবায়! নিজের সে অক্ষমতার এবং দুশ্চিন্তার কথা না তুলে বললাম, "ব্যবসা করব, কিন্তু অর্থ কোথায়?"

যোগীন্দ্রনাথ বললেন, "ধরুন, অর্থের যদি অভাব না ঘটে?"

বললাম, "কিন্তু শুধু অর্থেই তো ব্যবসা হয় না, সামর্থ্যও তো চাই।"

যোগীন্দ্রনাথ হাসতে লাগলেন, বললেন, "শুধু অর্থে ব্যবসা হয় না ব'লেই তো আপনাকে বলছি। অপরের অর্থের সঙ্গে আপনার সামর্থ্যের যদি যোগ হয়, তা হ'লে ব্যবসা কেন চলবে না বলুন?"

এই 'অপর' যে তিনি নিজে ছাড়া অপর কেউ নয়, তা বুঝতে অবশ্য বাকি ছিল না; বাকি ছিল শুধু বুঝতে আমার সামর্থ্যের কথা। বিস্মিত কণ্ঠে বললাম, "আমার সামর্থ্য কোন্ ব্যবসায়ের মধ্যে খুঁজে পেলেন?"

কৌতুকের হাস্যে যোগীন্দ্রনাথের দুই চক্ষু কুঞ্চিত হয়ে উঠল; বললেন, "সাহিত্যের ব্যবসায়ের মধ্যে। আপনি নিজে একজন সাহিত্যিক, সাহিত্যিকদের মধ্যে অনেকে আপনার বন্ধুবান্ধব আছেন, শরৎ চাটুজ্জে আপনার আত্মীয়,—আপনার সামর্থ্যের অভাব কোথায়?"

কথাটা তখন খোলাখুলিভাবে অগ্রসর হতে লাগল। সাহিত্যের ব্যবসায়ে তিনি যে গৌরী সেনের ভূমিকা গ্রহণ করবেন, সে কথা আর অনুক্ত রইল না। কাজের মানুষ,—মুখে মুখে মোটামুটিভাবে একটা পরিকল্পনা তখনি তখনি গ'ড়ে তুললেন। প্রথমে একটা মাসিক-পত্র, সঙ্গে সঙ্গে দু-চারখানি সুনির্বাচিত গ্রন্থের প্রকাশ, ক্রমশ গ্রন্থ প্রকাশ বিভাগের বিস্তার, তার পর একটি পুস্তক-বিক্রয়ের বিপণি, এবং শেষে

পর্যন্ত একটি উচ্চাঙ্গের দৈনিক সংবাদপত্র। এ সকল কাজ যথাসময়ে এবং যথোচিতভাবে নির্বাহের জন্য নিজস্ব ছাপাখানার একান্ত প্রয়োজন,—সুতরাং সর্বপ্রথমে একটি ছাপাখানা।

শুধু ব্যবসাই উদ্দেশ্য নয়, খবরের কাগজ প্রকাশ বিষয়ে তাঁর গোপন মনে একটা যে প্রবল শখ বর্তমান ছিল, সে কথা ধরা পড়তেও বাকি রইল না।

আমি দু-চার কথায় অতি সংক্ষেপে মোটামুটিভাবে তাঁর পরিকল্পনার কথা বললাম। তিনি কিন্তু এমন গুছিয়ে-গাছিয়ে সম্ভাব্যতার লোভনীয় রঙে এমন পরিপাটিভাবে রঞ্জিত ক'রে তাঁর পরিকল্পনার সুপরিণততর চিত্র অঙ্কিত করলেন যে, আমি থমথমিয়ে গেলাম। প্রস্তাবটা যে লোভ জাগিয়ে তোলবার পক্ষে যথেষ্ট চিত্তাকর্ষক তাতে আর সন্দেহ নেই। কলিকাতার প্রতি আমার চিরদিনই আকর্ষণ আছে। কিছুকাল পূর্বে চিত্তরঞ্জন আমাকে দুবার কলকাতায় আহ্বান করেছিলেন; দুবারই ভাগলপুর আমাকে তার আশ্রয়ে আটকে রেখেছিল। এবারকার আকর্ষণ কিন্তু প্রবলতর, কারণ এবার আহ্বান সাহিত্যের উপবনে—মাসিক-পত্রের বীণা বাজাবার জন্যে।

মাসিকপত্র সম্পাদনার একটা উগ্র অভিলাষ চিরদিনই আমার মনে-মনে, অন্তত নিশ্চেতন মনে, নিশ্চয়ই ছিল। প্রথমে সে বিষয়ে হাতেখড়ি নিয়েছিলাম ভবানীপুর-সাহিত্য-সমিতির হস্তলিখিত মাসিকপত্রিকা 'তরণী'তে। তার পর হাত পাকাই বন্ধুবর ফণীন্দ্রনাথ পাল সম্পাদিত 'যমুনা' মাসিকপত্রিকায়। এবার একেবারে খোদ নিজের দায়িত্বে সম্পাদন করবার আহ্বান! সুতরাং প্রস্তাব শুনে খানিকটা যদি থমথমিয়ে গিয়ে থাকি, তাতে এমন কিছু গুরুতর অপরাধ হয় নি।

আমার দ্বিধাগ্রস্ত ভাব লক্ষ্য ক'রে যোগীন্দ্রনাথ বললেন, "রাজী হয়ে

যান বেয়াই মশায়। বেশি ভেবে চিন্তে কোনো কাজ করা যায় না। ওটুকু দ্বিধা ত্যাগ করুন।"

যেটুকু দ্বিধা মনের মধ্যে ছিল তা ত্যাগ করলে ভাগলপুর ত্যাগ করবার প্রস্তাবটাই ত্যাগ করতে হয়। কিন্তু সে কথা ব'লে বেয়াই মশায়ের মনে দুঃখ না দিয়ে বললাম, "আচ্ছা, তা হ'লে সামান্য একটু ভেবে-চিন্তে দেখি।"

ভাগলপুর ফিরে গিয়ে বেয়াই মশায়কে খান-দুই চিঠি দিলাম, কিন্তু সাহিত্য-ব্যবসায়ের বিষয়ে টুঁ শব্দ করলাম না। দ্বিধা, কলিকাতায় যতটুকু উৎপন্ন হয়েছিল, তা প্রায় ত্যাগ ক'রেই ফেলেছি। মুদ্দই-মুদ্দালেহ্ এবং আপীলাণ্ট্-রিস্পণ্ডাণ্ট্দের মুখ দেখি, আর মনে মনে বলি, তোমাদের মায়া কাটিয়ে সহজে ভাগলপুর ছেড়ে যাব—এত বড় পাষাণ আমি নই।

মাস দুই পরে বেযাই মশায়ের এক চিঠি পেয়ে কিন্তু চক্ষু স্থির হ'ল। তিনি লিখেছেন, "একটি ছোটখাটো প্রিণ্টিং মেশিন কিনিয়া আমার কাজ আরম্ভ করিয়া দিয়াছি। এবার আপনার আসিবার পালা। আপনি আসিলেই প্রয়োজনমতো এবং আপনার উপদেশমতো সকল ব্যবস্থা করিব।"

কি বিপদেই না পড়া গেল! কাজের মানুষের সঙ্গে অকেজো মানুষের কর্মযোগের মত কর্মভোগ আর দ্বিতীয় কিছু নেই। অনেক ভেবে-চিন্তে অনেক কায়দা-কৌশল ক'রে এমন গোলমেলে একটা উত্তর দিলাম, যার যথার্থ মর্ম নির্ণয় করা, যোগীন্দ্রনাথের পক্ষে তো কথাই নেই, আমার পক্ষেও দুরূহ। যত্নপূর্বক কয়েকবার আমার উত্তর পাঠ ক'রে যদি কিছু তিনি একান্তই বুঝে থাকেন তো এইটুকুই হয়তো বুঝেছিলেন যে, কলিকাতায় আলোচনার পর যেটুকু দ্বিধা আমার মনে লেগে ছিল

ব'লে তাঁর মনে হয়েছিল, তার কিয়দংশ তখনও আমার মনে যাই যাই করছিল।

১৯২৫ সালের ডিসেম্বর মাসের শেষের দিকে বড়দিনের ছুটিতে কলিকাতায় এসেছি। ফেরবার সময় মলিনাকে এবং তার শিশুপুত্র ললিতকুমারকে ভাগলপুরে নিয়ে যাব, -অনেক দিন মলিনা পিত্রালয়ে যায় নি। ৪ঠা জানুয়ারি সন্ধ্যার ট্রেনে যাওয়া স্থির হয়েছে।

৪ঠা জানুয়ারি অপরাহ্ণে পটলডাঙা স্ট্রীটে যোগীন্দ্রনাথের গৃহে উপস্থিত হয়েছি, আর ঘণ্টাখানেক পরে রওনা হতে হবে। আমরা দুই বৈবাহিকে নানা বিষয়ে কথোপকথন করছি, তার মধ্যে কথায় কথায় যোগীন্দ্রনাথ বললেন, "দেখুন বেহাই মশায়, আপনার মেয়েটির মতো অমন বোকা মেয়ে সমস্ত ভূভারতে আমি আর একটিও দেখি নি। লোকে চিরকাল ওকে ঠকিয়ে খাবে, ও কিন্তু কোনোদিন কাউকে ঠকাবে না।"

উত্তরে আমি বললাম, "আপনি যে কথা বললেন বেয়াই মশায়, তার মধ্যে সব আশীর্বাদ ভরা আছে। ভগবানের অনুগ্রহে আপনার কথা যেন সত্যি হয়।"

কিছুক্ষণ পরে গাড়িতে তুলে দিয়ে আদরিণী পুত্রবধূর মাথায় হাত বুলিয়ে যোগীন্দ্রনাথ বললেন, "বাবা নিতে এসেছেন, যাচ্ছ যাও ; আমি কিন্তু শীঘ্রই তোমাকে নিয়ে আসছি।"

তাকিয়ে দেখি, শ্বশুর-পুত্রবধূ উভয়েরই চক্ষু চকচক্ করছে।

পরদিন অতি প্রত্যূষে ভাগলপুরে পৌঁছলাম। প্রচণ্ড শীতের দিন, রাজপথে লোক চলাচল তখনো প্রচুর হয় নি। গৃহে পৌঁছে দেখি, আমাদের প্রত্যাশায় অত ভোরেও বাড়িসুদ্ধ সকলে জাগ্রত হয়ে অপেক্ষা করছে। আমাদের গাড়ি কম্পাউণ্ডে প্রবেশ করা মাত্র হর্ষের একটা কলধ্বনি উত্থিত হ'ল। মাতাঠাকুরাণী তাঁর অতি আদরের পৌত্রীর জন্য ব্যস্ত

হলেন ; মাতাঠাকুরাণীর পুত্রবধূ কন্যার ক্রোড় থেকে তাঁর শিশু-দৌহিত্রকে ছিনিয়ে নিয়ে গৃহাভ্যন্তরে প্রবেশ করলেন। হাস্যে কৌতুকে গল্পে কথোপকথনে দেখতে দেখতে গৃহ চকিত হয়ে উঠল।

মাতাঠাকুরাণী মাঝে মাঝে তাগাদা দিচ্ছেন, "সমস্ত রাত্রি তোমরা গাড়িতে এসেছ, কাপড় বদলে মুখ-হাত ধুয়ে চা-টা খাও।" কিন্তু হয়তো মাতাঠাকুরাণী নিজেই আবার নূতন প্রসঙ্গের উত্থাপনের দ্বারা প্রথম আনন্দের সুযোগকে বাড়িয়ে তুলছেন।

তখনো আমি পায়ের জুতা উন্মোচিত করি নি, তখনো মলিনা তার ছোট ভাই-বোনদের আদর-আপ্যায়ন শেষ করবার সময় পায় নি, এমন সময়ে বাহিরের বারান্দায় হল-ঘরের দরজায় কড়া ন'ড়ে উঠল—কট্‌কট্‌ কট্‌কট্‌, আর সঙ্গে সঙ্গে ডাক শোনা গেল, "তার হ্যায় বাবুজী।"

তার হ্যায় ?—একটা অনির্ণেয় আতঙ্কে আনন্দমুখর গৃহ একেবারে মূক হয়ে গেল! এত সকালে হঠাৎ কিসের তার! তাড়াতাড়ি দরজা খুলে রসিদে সই ক'রে টেলিগ্রাম খুলে দেখে মানে বুঝতে পারি নে। কথাগুলো যেন দৃষ্টির সামনে জড়িয়ে যেতে আরম্ভ করেছে।

Father expired last night. Please come with Bowdidi soon—Subhir.

কি সর্বনাশ! এ সুধীর তো মনে হচ্ছে মলিনার দেওর সুধীরই! তবে কি বেয়াই মশায় এ জগতে আর নেই! মাত্র কয়েক ঘণ্টা আগে দেখে এসেছি—সবল সুস্থ সতেজ মানুষ, আর এরই মধ্যে এক্‌স্‌পায়ার্ড লাস্ট্‌ নাইট! কথাটা যেন কিছুতেই ধারণার মধ্যে আসতে চায় না।

কিন্তু সত্যি সত্যিই যখন ব্যাপারটা ঘটেছে, তখন না এসেই বা উপায় কি? মলিনা কাঁদতে লাগল, অতি করুণ মর্মান্তিক কান্না! হায় বেচারা! এমন শ্বশুরকেও কেউ এমনভাবে হারায়!

একটা দুর্বার বৈরাগ্যের কুজ্ঝটিকায় সমস্ত মনটা উদাস হয়ে গেল। শেষ পর্যন্ত সংসারটা তা হ'লে এতই অলীক! যোগীন মুখোপাধ্যায়ের মতো একজন কর্মী মানুষ, তাঁর জীবনের খানিক অংশ পরার্থে নিয়োজিত, তাঁরও রেয়াৎ নেই! যখন, যে মুহূর্তে ডাক পড়লেই হ'ল!

মলিনা একদিনও বিলম্ব করতে চাইলে না। সেই দিনই সন্ধ্যার গাড়িতে তাকে নিয়ে কলকাতায় ফিরলাম। বেয়াই মশায় বলেছিলেন, 'আমি কিন্তু শীঘ্রই তোমাকে নিয়ে আসছি।' কিন্তু তাই ব'লে এত শীঘ্র!

কলিকাতায় পৌঁছে অবগত হলাম, আমাদের রওনা ক'রে দেবার ঘণ্টা পাঁচ ছয় পরে আহারাদির পর যোগীন্দ্রনাথ তাঁর প্রতিদিনকার অভ্যাসমতো পুস্তক পাঠ করছিলেন। হঠাৎ শরীরটা খারাপ মনে হওয়ায় জল চেয়ে পান ক'রে বার দুই কাশলেন, তার পরই মাথা অবসন্ন হয়ে ঢ'লে পড়ল। মিনিট কয়েক পরে ডাক্তার এসে উপস্থিত হলেন। তখন কিন্তু যোগীন্দ্র ইহলোকের বন্ধন ছিন্ন করেছেন।

## ৬

যত দূর মনে পড়ে, যোগীন্দ্রনাথের মৃত্যুর মাস পাঁচ-ছয় পরে তাঁর পুত্রগণ, তাঁদের পিতা যে-বাসনা অপূর্ণ রেখে পরলোকগমন করেছিলেন, তা বাস্তবে পরিণত করবার জন্য আগ্রহান্বিত হলেন। ভাগলপুরে আমার কাছে তাঁদের অনুরোধ-পত্র এসে পৌঁছল।

যে প্রস্তাব যোগীন্দ্রনাথের জীবদ্দশায় আমাকে দ্বিধাগ্রস্ত ক'রে রাখতে পেরেছিল, মৃত্যুর মহনীয়তা তাকে আর নিবর্তিত হতে দিলে না। পূর্বে যা ছিল বাইরের লাভ লোকসানের বিবেচনা, এখন তা কতকটা হ'ল অন্তরের কর্তব্য-অকর্তব্যের কথা। হৃদয়বৃত্তির কাছে বিষয়বুদ্ধি অনেকটা নতি স্বীকার করলে।

মাসিকপত্র প্রকাশ করা স্থির হয়ে গেল।

যোগীন্দ্রনাথের দুটি ইচ্ছা আমি পূর্ণ করেছিলাম। মাসিকপত্র প্রকাশের প্রথম ইচ্ছা তিনি আমাদের কাছে নিজেই ব্যক্ত করেছিলেন; দ্বিতীয় ইচ্ছার কথা তিনি ডায়রিতে লিখে গিয়েছিলেন, যা তাঁর মৃত্যুর পর তাঁর ডায়রি পাঠকালে জানা যায়। ডায়রির এক স্থানে পাওয়া গিয়েছিল, 'উপেনবাবুর দ্বিতীয়া কন্যাটিকেও আমি পুত্রবধূ ক'রে নিয়ে আসব।' তদনুযায়ী উভয় পক্ষের, বিশেষত স্বয়ং পাত্রের ইচ্ছা এবং আগ্রহক্রমে যোগীন্দ্রনাথের তৃতীয় পুত্র কৃষ্ণকুমারের সহিত আমার দ্বিতীয়া কন্যা নীলিমার বিবাহ অনুষ্ঠিত হয়।

'বিচিত্রা' প্রথম প্রকাশিত হয় ১৩৩৪ সালের পয়লা আষাঢ়; নীলিমার বিবাহ হয় ঠিক তার এক বৎসর পরে ১৩৩৫ সালের আষাঢ় মাসে। কিছুকাল 'বিচিত্রা'য় বিজ্ঞাপনাদির নিম্নে যে কৃষ্ণকুমার মুখোপাধ্যায় কর্মাধ্যক্ষের নাম প্রকাশিত হ'ত, তিনিই যোগীন্দ্রনাথের তৃতীয় পুত্র।

মাসিকপত্র প্রকাশ করা স্থির হওয়ামাত্র আমার নিরবসর ধ্যান-জ্ঞান-চিন্তা হ'ল, কি ক'রে সে পত্রকে অনন্যসাধারণ ক'রে তোলা যাবে? সেই যখন জীবনের দীর্ঘ-অনুসৃত অধ্যায়ে ছেদ বসিয়ে সম্পূর্ণ পৃথক অধ্যায়ে প্রবেশ করতে উদ্যত হয়েছি, তখন সহজে সন্তুষ্ট হওয়া হবে না। আমার কল্পনার কাগজকে একান্তই যদি বাংলা দেশের প্রথম কাগজ না করতে পারি, অন্তত প্রথম শ্রেণীর করতেই হবে।

তা করতে হ'লে সে কাগজের উপর তখনকার বঙ্গ-সাহিত্য-গগনের সূর্য-চন্দ্র—রবীন্দ্রনাথ ও শরৎচন্দ্রের রশ্মিপাতের ব্যবস্থা করা আবশ্যক। রবীন্দ্রনাথের কথাটাই ভাবতে লাগলাম বেশি;—শরৎচন্দ্র তো ঘরের মানুষ, তাঁর সহায়তা শুধু চাইবার ওয়াস্তা। কিন্তু হায়! তখন কি জানি, কখন্ ঘরের মানুষ নিঃশব্দে বিনা নোটিসে দারুণ পরের মানুষ হয়ে ব'সে আছেন! সেই অতিশয় দুঃখের এবং নিরতিশয় কৌতুকের কাহিনী যথাসময়ে বলব, আপাতত রবীন্দ্রনাথের কথা বলি।

তখন প্রেমসুন্দর বসু শান্তিনিকেতন কলেজের অধ্যক্ষ। প্রেমসুন্দরের নিবাস ভাগলপুরে। তাঁর কনিষ্ঠ সহোদর সত্যসুন্দর আমার বিশেষ অন্তরঙ্গ বন্ধু। প্রেমবাবুর মধ্যস্থতায় আমি রবীন্দ্রনাথের সহিত সাক্ষাতের দিন এবং সময় স্থির করলাম এবং নির্দিষ্ট তারিখের পূর্বদিনে সকালের ট্রেনে ভাগলপুর থেকে যাত্রা ক'রে অপরাহ্ণে শান্তিনিকেতনে উপনীত হলাম।

পরদিন সকাল আটটায় রবীন্দ্রনাথের সহিত দেখা করবার সময়। চা-পানের পর প্রেমবাবুর সঙ্গে জমিয়ে ব'সে গল্প আরম্ভ করলাম—ভাগলপুরের গল্প, শান্তিনিকেতনের গল্প, রবীন্দ্রনাথের গল্প, আমার উদয়োন্মুখ মাসিকপত্রের গল্প।

প্রেমবাবু জিজ্ঞাসা করলেন, "তোমার মাসিকপত্রের নাম কিছু ঠিক করেছ উপেন?"

বললাম, "কতকগুলো ভেবে রেখেছি,—তার মধ্যে একটা প্রায় স্থির ক'রে ফেলেছি।"

ঔৎসুক্যসহকারে প্রেমবাবু জিজ্ঞাসা করলেন, "কি বল তো?"

বললাম, "'সবিতা'।"

মনে মনে একটু ভেবে দেখে প্রেমবাবু বললেন, "ভাল নাম। বড়ও নয়, শুনতেও মিষ্টি।"

বললাম, "অনেক নাম ভেবে-চিন্তে বার করেছি প্রেমবাবু—গোটা কুড়িকের কম হবে না। তিন অক্ষর নামের মধ্যে 'সবিতা'ই শ্রেষ্ঠ। একটা চার অক্ষর নামও আমার পছন্দ।"

"কি?"

"'হিমালয়'।"

প্রেমবাবু বললেন, "'সবিতা' আর 'হিমালয়ে'র মধ্যে 'সবিতা'ই ভাল।"

বললাম, "হ্যাঁ, 'সবিতা'র মধ্যে তেজ আর দীপ্তি দু-ই আছে। আমাদের নির্জীব আর বিমর্ষ বাংলা দেশে এই দুটি জিনিসের বিশেষ দরকার। পারুক আর নাই পারুক, মাসিক 'সবিতা' যদি এ দুটি জিনিস বাড়িয়ে তোলবার কিছু চেষ্টা করে, তাও ভাল।"

প্রেমবাবু হাসতে লাগলেন।

পরদিন প্রাতে চা-পানের পর আটটার কিছু পূর্বে আমরা দুজনে রবীন্দ্রনাথের গৃহের উদ্দেশ্যে বেরিয়ে পড়লাম। আটটার সময়ে রবীন্দ্রনাথ আমাদের প্রত্যাশা করবেন।

পথ চলতে চলতে প্রেমবাবু এক সময়ে আমাকে বললেন, "দেখ উপেন, কবির সময়ের মূল্য অত্যন্ত বেশি। যতটুকু তোমার কাজের কথা, তা বলা হয়ে গেলেই উঠে পড়বে।"

আমি বললাম, "এ কথা মনে করিয়ে দিয়ে ভালই করেছেন। কিন্তু

না মনে করিয়ে দিলেও আমার ভুল হ'ত না। আমি অকারণ কবির এক মুহূর্ত সময়ও নষ্ট করব না। তাঁর সময় নষ্ট করার মানেই তো আমাদের নিজেদের বঞ্চিত করা।"

রবীন্দ্রনাথ আমাদের জন্য অপেক্ষা করছিলেন। আমরা উভয়ে তাঁর কাছে উপস্থিত হয়ে প্রণাম ক'রে উপবেশন করলাম।

সাধারণভাবে দু-চার মিনিট আলাপ-আলোচনার পর কাজের কথা আরম্ভ হ'ল। আমার যা বক্তব্য এবং প্রার্থনা, তা তো তিনি মোটামুটি পূর্বেই অবগত হয়েছিলেন; তদতিরিক্ত যা দু-চার কথা তাঁর জানবার ছিল, প্রশ্ন ক'রে ক'রে জেনে নিলেন। মনে হ'ল, আমার উত্তরের সুস্পষ্ট এবং অনাবৃত ব্যঞ্জনায় তিনি সন্তুষ্ট হলেন। বললাম, "আপনার কাছ থেকে যে দান আমরা পাব, তা আমাদের কাগজের শিরায়-উপশিরায় প্রবাহিত হবে; কিন্তু এ ভরসাও আপনার কাছে ক'রে যাচ্ছি, যে উৎসাহের সঙ্গে আমরা সে দানের দক্ষিণা নিবেদন করব, সে উৎসাহ আপনাকে অপ্রসন্ন করবে না। কারণ আমরা জানি, আপনাকে দেওয়ার মানে শান্তিনিকেতনকে দেওয়া, আর শান্তিনিকেতনকে দেওয়ার মানেই নিজেদের তা ফিরে পাওয়া।"

রবীন্দ্রনাথের মুখে-চক্ষে প্রসন্নতার সুস্পষ্ট দীপ্তি ফুটে উঠল; তিনি আমাকে অকুণ্ঠিত সহায়তার প্রতিশ্রুতি দিলেন। উত্তরে আমি আমার অন্তরের প্রগাঢ় কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করলাম।

রবীন্দ্রনাথ জিজ্ঞাসা করলেন, "তোমার কাগজের নাম কিছু ঠিক করেছ না-কি?"

বললাম, "পাকাভাবে এখনও কিছু ঠিক করি নি, তবে আপাতত ভাবছি 'সবিতা' রাখলে হয়।"

স্মিতমুখে প্রেমবাবু বললেন, "'সবিতা' ছাড়া উপেন আরও একটা নাম ভাবছে।"

আমি রবীন্দ্রনাথের সামনা-সামনি ব'সে ছিলাম; প্রেমবাবু ব'সে ছিলেন রবীন্দ্রনাথের বাঁ পাশে একটু পিছন দিকে হ'টে। ঘাড় ঈষৎ বেঁকিয়ে প্রেমবাবুর প্রতি দৃষ্টিপাত করবার চেষ্টা ক'রে রবীন্দ্রনাথ বললেন, "'সবিতা' তো বেশ নাম। আবার কি নাম হে?"

প্রেমবাবু বললেন, "'হিমালয়।'"

কুঞ্চিতস্মিত চক্ষে আমার প্রতি দৃষ্টিপাত ক'রে রবীন্দ্রনাথ বললেন, "'সবিতা' অথবা 'হিমালয়'? নাঃ, তোমার পছন্দ যে উঁচুস্তরের, তা স্বীকার করতেই হ'ল।"

কবির এই সরস বাক্যভঙ্গীতে খুশি হয়ে প্রেমবাবু আর আমি হাসতে লাগলাম।

রবীন্দ্রনাথ জিজ্ঞাসা করলেন, "ওকালতি ছেড়ে দেবেই তো?"

বললাম, "এক-একবার মনে করি, আলিপুরের আদালতে না-হয় নামটা জিইয়ে রাখলে হয়। কিন্তু শেষ পর্যন্ত বোধ হয় ছেড়েই দিতে হবে।"

রবীন্দ্রনাথ বললেন, "হ্যাঁ, এক নৌকোতেই দু পা রাখা ভাল,—তা সে যে-নৌকোই হোক।"

সাধারণভাবে কথোপকথন পুনরায় চলতে আরম্ভ করল।

রবীন্দ্রনাথের নিকট হতে লেখা পাওয়ার প্রতিশ্রুতি লাভের সঙ্গে সঙ্গে প্রেমবাবু ধ'রে নিয়েছিলেন, কাজের কথা শেষ হয়েছে; তার পরও ব'সে থেকে কথা-চালানোর অর্থ—কবির অমূল্য সময় নষ্ট করা ভিন্ন আর কিছুই নয়। সেই বিষয়ে সচেতন ক'রে দেবার উদ্দেশ্যে তিনি ভ্রূ-আকুঞ্চন এবং শিরঃসঞ্চালনের বিশেষ এক কৌশলের সাহায্যে আমার প্রতি ঘন

ঘন নিঃশব্দ ইঙ্গিত ছাড়তে লাগলেন। আমি পড়লাম বিপদে। প্রেমবাবুর ইঙ্গিতের ফলে অনিবার্যভাবে আমার মুখে-চক্ষে-দেহে, যত সামান্যই হোক, উঠে পড়বার একটা অভিপ্রায়ের ছাপ পড়তে লাগল, অথচ রবীন্দ্রনাথের অসমাপ্ত বাক্যের মধ্যে উঠে দাঁড়াবার ধৃষ্টতা এবং প্রবৃত্তি উভয়েরই অভাব বোধ করতে লাগলাম। প্রেমবাবুর প্রতি দৃষ্টিপাত না ক'রে রবীন্দ্রনাথের কথা শুনে যাব, তাও কঠিন ব্যাপার। কেবলই ঔৎসুক্য হয়, দেখি এখনও প্রেমবাবু ইঙ্গিত ছাড়ছেন কি-না; আর দেখেছি কি না-দেখেছি, অমনি কি তিনি ভ্রূ নেড়েছেন।

প্রখরবুদ্ধিশালী মানুষ রবীন্দ্রনাথ। আমার দেহের উপর দুনিরীক্ষ্য লক্ষণ দেখে বুঝেছেন, পিছন দিক থেকে নির্বাক সিগ্‌নালিং চলছে। স্মিতমুখে বললেন, "ওহে প্রেমসুন্দর!"

ব্যস্ত হয়ে চেয়ার ছেড়ে সামনে এসে দাঁড়িয়ে প্রেমসুন্দর বললেন, "আজ্ঞে?"

রবীন্দ্রনাথ বললেন, "শহর থেকে দূরে মাঠের মধ্যে আমরা বাস করি। এখানে না আছে বাজার, না আছে দোকান। অতিথি এলে আমরা খুশি হই বটে, কিন্তু অতিথি-সংকার কি ক'রে করা যাবে—সে কথা ভেবে চিন্তিতও কম হই নে। তখন, এ-বাড়ি থেকে একটু ভাজা মুগের ডাল, ও-বাড়ি থেকে কিছু আচার, সে-বাড়ি থেকে গাছের একটা তাজা লাউ—এইভাবে উপকরণ সংগ্রহ ক'রে আমরা অতিথি-সংকারের ব্যবস্থা করি। তোমার বাড়িতে অতিথি এসেছেন, তোমাকেও তাই করতে হবে। তুমি না-হয় সেই সব ব্যবস্থা দেখগে, ইনি আমার কাছে একটু বসুন।"

এ কথার পর আর এক মুহূর্ত বিলম্ব করাও চলে না, আমাকে তুলে নিয়ে যাওয়াও যায় না। "যে আজ্ঞে" ব'লে প্রেমবাবু স'রে পড়লেন, আমিও চেপে বসলাম।

সঙ্গে সঙ্গে আমি রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে একটা চুক্তিতে আবদ্ধ হবার জন্য এক প্রস্তাব করলাম ; বললাম, "আমার একটা নিবেদন আছে।"

কৌতূহলী হয়ে রবীন্দ্রনাথ বললেন, "কি বল তো ?"

বললাম, "কাগজের সম্পর্কে এখন থেকে তো আমাকে সর্বদাই আপনার সঙ্গে দেখা করতে হবে ?"

রবীন্দ্রনাথ বললেন, "তা তো হবেই।"

বললাম, "আপনার সঙ্গে দেখা করতে গেলে শুধু কাজের কথাটুকু শেষ ক'রে তৎক্ষণাৎ উঠে পড়তে হয়তো অনেক সময়েই পেরে উঠব না। আপনার সঙ্গ আর কথাবার্তা থেকে যে আনন্দ পাব, তার আকর্ষণে উঠতে উঠতে হয়তো দেরি হয়ে যাবে। অথচ, আপনার মূল্যবান সময় নষ্ট করছি—সেই চিন্তা সেই আনন্দের মধ্যে কাঁটার মতো খচখচ করবে।"

কুঞ্চিত নেত্রে আমার প্রতি দৃষ্টিপাত ক'রে রবীন্দ্রনাথ বললেন, "এ কঠিন সমস্যার সমাধান কি ?"

বললাম, "আপনি যদি আমাকে আশ্বাস দেন, যখনই আপনার মনে হবে—আমার প্রয়োজন ফুরিয়েছে, আর আমার না থাকলেই ভাল হয়, তখনই আমাকে বলবেন, 'আচ্ছা, আর একদিন না-হয় এসো, আজ তুমি যাও',—তা হ'লে আমি নিশ্চিন্ত হয়ে আপনার কাছে বসতে পারব।"

আমার কথা শুনে রবীন্দ্রনাথের মুখে মৃদু হাস্য ফুটে উঠল ; মনে মনে একটু কি চিন্তা ক'রে বললেন, "আচ্ছা, সে আশ্বাস তোমাকে আমি দিলাম। কিন্তু তুমি যে কথা বললে, এমন কথা আমাদের দেশে খুব বেশি লোক বলে না। নিজের সময় আমরা নষ্ট করি,—তার না-হয় এক দিক থেকে কতকটা মার্জনা থাকতে পারে ; কিন্তু পরের সময় আমরা এমন নির্লজ্জভাবে নষ্ট করতে জানি, যার কোনো দিক থেকেই কোনো

মার্জনা নেই। চার-পাঁচ দিন আগে একটি লোক কি-ভাবে আমার সময় নষ্ট করেছিল, তার গল্প বলি শোন।"

গল্প শোনবার জন্য উৎসুক হয়ে বসলাম।

রবীন্দ্রনাথ বলতে আরম্ভ করলেন।—

চার-পাঁচ দিন আগের কথা। সকালে ঘুম ভাঙার সঙ্গে সঙ্গেই মনের মধ্যে একটা ভাব উঁকিঝুঁকি মারতে আরম্ভ করেছে। তার মুখখানা স্পষ্ট মালুম হচ্ছে, কিন্তু আর সব অঙ্গ তখনো অস্পষ্ট। মনে মনে সঙ্কল্প করলাম, তাড়াতাড়ি মুখ-হাত ধুয়ে প্রাতরাশ সেরে খাতা-কলম নিয়ে ব'সে তাকে বন্দী ক'রে ফেলতে হবে।

কাজকর্ম সারতে যতই ঘোরাফেরা করছি, মনের মধ্যে ভাবটা ততই বেশি বেশি ধরা দিতে আরম্ভ করেছে। অবশেষে ঘণ্টাখানেক পরে খাতা খুলে কলম নিয়ে যখন বসলাম, তখন সে আত্মসমর্পণ করবার জন্য প্রস্তুত।

ভাষার জালে তাকে আবদ্ধ করতে উদ্যত হয়েছি, এমন সময়ে ভৃত্য এসে এক খণ্ড কাগজ দিলে, তাতে এমন এক নাম লেখা যাতে মনে হয়, আগন্তুক ভারতবর্ষের কোনো সুদূর প্রদেশের অধিবাসী। নামের উপরে ইংরাজীতে লেখা পাঁচ মিনিটের দর্শনপ্রার্থী।

সমস্যা দেখা দিলে। কি করা যায় এখন? কবিতা শেষ ক'রে যদি দেখা করতে যাই, তা হ'লে দীর্ঘ সময়ের জন্য ভদ্রলোককে অপেক্ষা করিয়ে রাখা হতে পারে। সেরূপ অবস্থায় ভারতবর্ষের এক প্রান্তে দুর্নাম র'টে যাবে যে, বাংলা দেশে রবি ঠাকুর নামে এমন এক অশিষ্ট মানুষ আছে, যার কাছে পাঁচ মিনিটের জন্যে দর্শনপ্রার্থী হ'লে এক ঘণ্টা পাঁচ মিনিট পরে দেখা দেয়। তা ছাড়া, একজন পাঁচ মিনিটের দর্শনপ্রার্থী বাইরে ব'সে অপেক্ষা করতে করতে ক্রমশ অধীর হয়ে উঠছে— এমন একটা উদ্বেগ

মনের মধ্যে সজাগ থাকলে কবিতার পথ অবাধ হবে না। তার চেয়ে দর্শন দেওয়া সেরে এসে নিশ্চিন্ত হয়ে বসাই ভাল। পাঁচ মিনিট বই তো নয়। না হয় দশ কিংবা পনের মিনিট—বড় জোর আধ ঘণ্টা।

খাতার মধ্যে কলম রেখে বাইরে এসে দেখি, একটি তরুণ যুবক। আমাকে দেখতে পেয়ে তাড়াতাড়ি এগিয়ে এসে প্রণাম ক'রে দাঁড়িয়ে রইল। তাকে বসতে ব'লে আমি উপবেশন করলাম।

আমার সামনে একটা চেয়ারে কুণ্ঠিতভাবে ব'সে সে বললে, 'আজ আমার সুপ্রভাত! আজ আমার জীবনের শুভদিন! আজ আমি ভারতবর্ষের শ্রেষ্ঠ পুরুষের দর্শন পেলাম!'

খুশি হলাম। হিসেবমতো খুশি হওয়াই উচিত। এমন সুন্দর কথা শুনে যে খুশি না হয়, সে জড় পদার্থ। জিজ্ঞাসা করলাম, কোথায় থাক? কি কর? বাংলা দেশে কবে এলে?

এ সকল প্রশ্নের অতিশয় দ্রুতগতিতে আর অতি সংক্ষেপে উত্তর শেষ ক'রে সে আবার বলতে লাগল, 'আজ আমি ভারতবর্ষের শ্রেষ্ঠ পুরুষের দেখা পেলাম! আজ আমার জীবন সার্থক! আজ আমার জীবনের সুপ্রভাত!'

এবারও খুশি হলাম। বস্তুত কথাগুলি এতই আনন্দদায়ক যে, পুনরুক্তির প্রত্যাশায় কান খাড়া ক'রে থাকলেও দোষ দেওয়া যায় না। আমার পক্ষ থেকে জিজ্ঞাসা করলাম, কতদিন এ অঞ্চলে থাকবে? কি উদ্দেশ্যে এ অঞ্চলে এসেছ? শান্তিনিকেতন তোমার কেমন লাগল?

এবারও প্রথম বারের ন্যায় যত শীঘ্র এবং যত সংক্ষেপে সম্ভব আমার প্রশ্নের উত্তরগুলো সেরে ফেলে সে পুনরায় সেই শ্রেষ্ঠ পুরুষ আর সুপ্রভাতের অবতারণা করলে। এবার কিন্তু তেমন আর ভাল লাগল না। আমি অপরাপর প্রসঙ্গ চালাবার আর বাড়াবার চেষ্টা করি, সে

কিন্তু কিছুতেই বাগ মানে না; থেকে থেকে ভারতবর্ষের শ্রেষ্ঠ পুরুষকে নিয়ে টানাটানি করে।

আধ ঘণ্টা আগে 'পাঁচ মিনিট' হয়ে গেছে; অবশেষে এক ঘণ্টাও হতে চলল। যে কথা কিছু আগে মধু হয়ে কানে প্রবেশ করছিল, এখন তা ফুটন্ত মধু হয়ে কানকে পীড়িত করছে।

অবশেষে ঘণ্টা দেড়েক পরে সে যখন উঠে দাঁড়িয়ে আর একবার সুপ্রভাতের প্রসঙ্গ উত্থাপিত করলে, তখন ভারতবর্ষের শ্রেষ্ঠ পুরুষের দেহের রক্ত নিশ্চয় টগবগিয়ে ফুটছিল, নইলে মাথা অমন গরম হবে কেন?

ভিতরে প্রবেশ ক'রে মুখে চোখে মাথায় জল দিয়ে যখন খাতা নিয়ে আর একবার বসলাম, তখন 'সুপ্রভাতে'র উৎপীড়নে ভাব বেচারা এমন অন্ধকার রাত্রির মধ্যে আত্মগোপন করেছে যে, তার টিকিও আর দেখা গেল না।

রবীন্দ্রনাথ তাঁর গল্প শেষ করলেন। শুনে কিছু হয়তো কৌতুক বোধ করলাম; কিন্তু দুঃখই পেলাম বেশি। পাঁচ মিনিটের দর্শনপ্রার্থীর জন্যে সেদিন হয়তো বাংলা-সাহিত্য একটা বহুমূল্য রত্ন হতে বঞ্চিত হ'ল!

প্রায় ঘণ্টা দুয়েক রবীন্দ্রনাথের সান্নিধ্যে অতিবাহিত ক'রে প্রসন্ন মনে পরিতৃপ্ত চিত্তে প্রেমবাবুর গৃহের দিকে অগ্রসর হলাম।

রবীন্দ্রনাথের নিকট হতে আশ্বাস লাভের পর প্রেমবাবুকে সঙ্গে নিয়ে শান্তিনিকেতনের বিশিষ্ট সাহিত্যিক এবং চিত্রশিল্পীগণের সহিত সাক্ষাৎ করলাম। ইতিপূর্বেই প্রেমবাবু এদের মধ্যে আমার কাগজের পক্ষে খানিকটা প্রচার-কার্য ক'রে রেখেছিলেন। আমার মাসিকপত্র সুবৃহৎ আকারের সচিত্র কাগজ হবে এবং রবীন্দ্রনাথ তাতে প্রচুরভাবে লেখা দিতে স্বীকৃত হয়েছেন অবগত হয়ে সকলে বিশেষ সুখী হলেন এবং তাঁরাও যথাসম্ভব সাহায্য করবেন, সে প্রতিশ্রুতি দিলেন।

সেই দিনের রাত্রের ট্রেনেই ভাগলপুর প্রত্যাবর্তন করলাম।

কয়েকদিন পরেই শরৎকে একটা দীর্ঘ ও বিস্তারিত চিঠি লিখলাম। রবীন্দ্রনাথ নিয়মিতভাবে লেখা দিতে স্বীকৃত হয়েছেন জানিয়ে লিখলাম, আর চিন্তার কারণ নেই; তোমাদের উভয়ের লেখার পাখায় ভর দিয়ে আমার কাগজ সফলতার সুদূর আকাশে উপনীত হতে পারবে।

শরৎকে বরাত দিলাম, প্রথম সংখ্যা থেকে একটি ধারাবাহিক উপন্যাসের এবং মাঝে মাঝে একটি ক'রে গল্পের। যার বাগানে যে ফুল ফোটে, তাকে দিতে হবে সেই ফুলের বরাত। রবীন্দ্রনাথের কাছেও একটি উপন্যাসের প্রার্থনা জানিয়ে এসেছি; কাব্যের তো কথাই নেই। মেঘের নিকট জলের প্রার্থনা করবার প্রয়োজন হয় না,—আপনিই পাওয়া যায়।

শরৎকে চিঠি লেখার দিন চার-পাঁচ পর থেকে প্রত্যহই উত্তরের প্রত্যাশায় থাকি, উত্তর কিন্তু আসে না। মনে মনে ভাবি, অলস মানুষ,

তাড়াতাড়ি উত্তরই বা কেন দিতে যাবে ;—নোটিস পেয়েছে, হয়তো একেবারে উপন্যাস ফাঁদবার কাজেই ব্যস্ত আছে।

যত দূর মনে পড়ে, শরৎকে চিঠি লিখেছিলাম ১৩৩৩ সালের শ্রাবণ মাসে। ১৩৩৩ সালের ফাল্গুন মাসে থেকে কাগজ বার করবার তখন আমাদের কল্পনা। সুতরাং হাতে খুব বেশি সময় ছিল না। একটা প্রমাণ-আয়তনের মাসিকপত্র আরম্ভ করবার জন্য অন্তত মাস ছয়েক কালের উদ্যোগ-পর্বের প্রয়োজন। মাস তিনেকের মতো নির্বাচিত মুদ্রণ-বস্তু হাতে না জমিয়ে ছাপাখানায় কপি পাঠালে ভবিষ্যতে অসুবিধায় পড়বার আশঙ্কা থাকে। তা ছাড়া, সচিত্র প্রবন্ধাদির জন্য প্রবন্ধ ও চিত্র সংগ্রহ, ব্লক-প্রস্তুতকরণ প্রভৃতি সময়সাপেক্ষ ব্যাপার তো আছেই। দিকে দিকে লেখকদের নিকট প্রবন্ধাদির জন্য চিঠি ছাড়তে লাগলাম। শরৎকে আর একখানা স্মারকলিপি লিখব লিখব করছি, এমন সময়ে কলিকাতায় যাবার প্রয়োজন উপস্থিত হ'ল। ভাবলাম, তবে আর চিঠি-চাপাটি কেন, একেবারে সশরীরে সরেজমিনে উপস্থিত হয়ে হয়তো উপন্যাসের প্রথম কিস্তির কপি হাতে ক'রেই ফিরে আসা চলবে।

তখন সরেজমিন—রূপনারায়ণ নদের পূর্ব উপকূলবর্তী হাওড়া জেলার সমতাবেড় গ্রামে। হাওড়া স্টেশনে বেঙ্গল-নাগপুর রেলের ট্রেনে আরোহণ ক'রে দেউলটি স্টেশনে নামতে হয়। সেখান থেকে, হয় পদব্রজে, নয় পালকি চ'ড়ে খানিকটা রূপনারায়ণের বাঁধের ওপর দিয়ে মাইল দেড়েক-দুই উত্তরে পানিত্রাস ডাকঘরের অন্তর্গত সমতাবেড় গ্রাম। শরৎচন্দ্রের গৃহ রূপনারায়ণ নদের একবারে অব্যবহিত উপকূলে।

এই সামতাবেড় গ্রামে শরৎচন্দ্রের দিদি অনিলার বাস। বর্মা ত্যাগ করবার পর হাওড়া বাজে-শিবপুরে একটি গৃহ ভাড়া ক'রে শরৎচন্দ্র বাস করতে আরম্ভ করেন। তার পর ভগ্নী এবং ভগ্নীপতির আগ্রহে এবং

চেষ্টায় সমতাবেড়ে জমি ক্রয় ক'রে গৃহ নির্মাণ করেন। যে সময়ের কথা বলছি, তার বোধ করি বৎসরখানেক পূর্বে বাজে-শিবপুরের গৃহ ছেড়ে দিয়ে শরৎচন্দ্র সামতাবেড়ে বাস করতে আরম্ভ করেছেন।

অতি অল্প সময়ের মধ্যে শরৎচন্দ্র সমতাবেড়ের বিশেষ অনুরাগী হয়ে ওঠেন। কেউ সামতাবেড়ের নিন্দা করলে তিনি সহ্য করতে পারতেন না। বিশেষত সামতাবেড়ের স্বাস্থ্যকরতার বিরুদ্ধে কারো কোনো কথা বলবার উপায়ই ছিল না। শরৎচন্দ্র বলতেন, 'বাংলা দেশের মধ্যে সামতাবেড়ের মতো স্বাস্থ্যকর গ্রাম আর একটি আছে কি না সন্দেহ। এখানকার বুড়ো মানুষদের লাঠি মেরে না মারলে রোগে ভুগে তারা মরতে জানে না।' এ কথার প্রমাণস্বরূপ বলতেন, 'মুখুজ্জে মশায় (অনিলার স্বামী) দুঃখ ক'রে বলেন—বয়স তো নিতান্ত কম হ'ল না, তা সত্তর-বাহাত্তর বৎসর তো হ'ল, কিন্তু একটু নিশ্চিন্ত হয়ে যে তামাক খাব, তার উপায় নেই; হুঁকো হাতে নিয়ে যে দিকে ফিরি, সেই দিকেই দেখি কোনো-না-কোনো মুরুব্বি দাঁড়িয়ে আছে।'

কলকাতায় এসে উঠলাম মেজদাদার বাসায়। বাগবাজার স্ট্রীটের উপর পশুপতি বসুদের বিস্তৃত কম্পাউণ্ডের দক্ষিণ-পশ্চিম কোণের দ্বিতল গৃহটি ভাড়া নিয়ে তিনি সপরিবারে বাস করতেন। আমি অধিকার করলাম একেবারে পথের ধারের ঘর। সমস্ত দিন কাজকর্মের ধান্দায় ঘুরে-ফিরে বেড়াই। রাত্রে বাড়ি ফিরে আহারাদির পর কিছুক্ষণ লেখা-পড়া করি। তার পর রাত্রি বারোটা তাকাতাকি আলো নিবিয়ে শুয়ে প'ড়ে পারলৌকিক ডাক শুনতে থাকি। সেবার বাগবাজার স্ট্রীটের ধারে সেই ঘরটিকে থাকতে ওটা যেন আমার একটা নেশার মতো দাঁড়িয়ে গিয়েছিল। নিদেন পক্ষে এক কিস্তি না শুনলে ঘুমটা বেশ নিবিড় হয়ে নামত না। কথাটা একটু খুলে বলি।

বাগবাজার স্ট্রীট ঠিক যেন একটা বৃহৎ চুঙ্গির ( funnel ) নলের অংশের মতো। সেই চুঙ্গির আধার-অংশটা বাগবাজার স্ট্রীটের পূর্বদিকের পাঁচ-সাত বর্গ-মাইল বিস্তৃত লোকালয়। চুঙ্গির নলের অংশটা শেষ হয়েছে কাশীমিত্রের শ্মশান-ঘাটে। সুতরাং পাঁচ-সাত মাইল বিস্তৃত আধার হতে নল বেয়ে রথে সওয়ার হয়ে যারা আসত তারা সকলেই পরপারের যাত্রী, আর 'বল হরি, হরিবোলে'র যে ডাক শুনতে শুনতে তারা মহাযাত্রা করত তাকেই বলছি পারলৌকিক ডাক।

সে সময়ে দণ্ডপাণির কার্যালয়ে বোধ করি বিশেষ একটু কর্মতৎপরতা দেখা দিয়েছিল; সেই জন্যে পারলৌকিক ডাক এক-এক দিন তিন কিস্তি পর্যন্ত শোনা যেত। কাজকর্ম যতক্ষণ করতাম, কতকটা অন্যমনস্ক হয়ে থাকতাম। কিন্তু সুইচ তুলে ঘর অন্ধকার ক'রে শুলেই কান দুটি খাড়া হয়ে উঠত ডাক শোনার প্রত্যাশায়,—সত্যি কথা বলতে হলে, একটু যেন উদ্বেগেও। ভয়, এমন কি আতঙ্ক, বলতে যা বোঝায়, তা নিশ্চয়ই হ'ত না। কিন্তু হঠাৎ যখন আমাদের বাড়ির পূর্বদিকে অনতিদূরে নিষুপ্ত রাত্রির নিশ্চিন্ত স্তব্ধতাকে বিদীর্ণ ক'রে 'বল হরি' ধ্বনিত হয়ে উঠত, এবং মিনিট দুয়েক পরেই আমার শয্যার আট-দশ ফুট দূরে পরলোকের যাত্রীর রথের ক্যাঁচ-ক্যোঁচ শব্দের সহিত ভারবহনের গুরু পদধ্বনি যুক্ত হয়ে রাজপথকে চকিত ক'রে তুলত, তখন মনের মধ্যে যে অনধিগম্য এবং অনিবার্য অনুভূতির সৃষ্টি হ'ত তার যথোচিত প্রতি-শব্দ অভিধানে খুঁজে পেতাম না।

এই অনির্বচনীয় অনুভূতি প্রগাঢ় হয়ে উঠত, যেদিন শ্রান্ত শ্মশান-[illegible] আমার ঘরের সম্মুখে পথের এক পার্শ্বে শবাধার রেখে শ্রান্তি অপনোদন করত। রুদ্ধদ্বার ঘরের মধ্যে আবদ্ধ হয়ে আমার খাটে শুয়ে সজীব আমি চিন্তাগ্রস্ত; ওদিকে পাঁচ-সাত হাত দূরে শ্রীমান্ নির্জীব

মুক্ত আকাশতলে তাঁর নিজের খাটে শুয়ে নিশ্চিন্ত। জীবন ও মৃত্যুর এরূপ সন্নিহিত অবস্থায় জীবিতের উত্তপ্ত হৃদয়ের উপর মৃত্যুর হিমস্পর্শ একটু শীতল শিহরণ জাগিয়ে তুলবে, তাতে বিস্ময়ের তেমন কিছু ছিল না।

আমার ঘর ছাড়িয়ে পারলৌকিক শোভাযাত্রা পশ্চিম দিকে অগ্রসর হ'ত। আমি শুয়ে শুয়ে শ্মশানযাত্রীদের ডাক শুনতাম, 'বল হরি—হরিবোল'। বার পাঁচ-সাত বেশ স্পষ্টই শোনা যেত; তার পর ক্রমশ অস্পষ্ট হয়ে আসতে আসতে শেষ পর্যন্ত পরিণত হ'ত মাত্র পদান্তের 'ওল্' শব্দে। এই 'ওল্' শব্দ কিছুতেই যেন আমাকে ছাড়তে চাইত না, বহুক্ষণ ধ'রে একটা নেশার মতো আমাকে আকৃষ্ট ক'রে রাখত। প্রথম বার-তিন-চার অবশ্য আমার কানই তা শুনত; কিন্তু তার পর, আমার বিশ্বাস, শুনতে থাকত আমার মস্তিষ্ক। ঘুমিয়ে পড়বার আগ্রহে এ-পাশ ও-পাশ করতাম, কিন্তু তারই মাঝে মাঝে শুনতে পেতাম, 'ওল্!' 'ওল্!' অবশেষে 'ওল্' শব্দ বন্ধই হ'ত অথবা বন্ধ হওয়ার পূর্বেই আমি ঘুমিয়ে পড়তাম, সব সময়ে তা ঠিক বুঝতে পারতাম না।

কলিকাতায় আসার দিন চার-পাঁচ পরে শরতের সঙ্গে দেখা করতে সামতাবেড় যাবার জন্য প্রস্তুত হলাম। বাড়িতে বললাম, "শরতের কাছে যাচ্ছি, বৈকালের আগে কিছুতেই ছাড়বে না; সুতরাং স্নানাহার সব-কিছুই তার বাড়িতে।" মুখ-হাত ধুয়ে চা-খাবার খেয়ে সকাল সকাল বেরিয়ে পড়লাম।

হাওড়া থেকে রেলে দেউলটি পৌঁছতে ঘণ্টা দুয়েক সময় লাগে। দেউলটি পৌঁছে স্টেশন-সংলগ্ন দেউলটির বাজার থেকে একটা পালকি ভাড়া করলাম। এই আমার দ্বিতীয়বার পানিত্রাসে আসা, সুতরাং পথঘাট ততটা সড়গড় নেই। দেউলটি স্টেশন ছেড়ে জগন্নাথ সড়ক পার

হয়ে খানিকটা গিয়ে পথ একটা ক্ষুদ্র বসতির অলিগলির ভিতর দিয়ে গেছে। প্রথমবারে পদব্রজে যেতে গিয়ে সেখানটায় একটু অসুবিধেয় পড়তে হয়েছিল। তা ছাড়া, ভাদ্র মাস, আকাশে একটু মেঘের আড়ম্বরও আছে; তাই একটা পালকি ভাড়া যুক্তিযুক্ত মনে করলাম।

পালকি চ'ড়ে দুলতে দুলতে অগ্রসর হলাম। ডান দিকে প্রসারিত ধান্যক্ষেত্র; তার সুদূর প্রান্তে লোকালয়ের গাছ-গাছড়া যেন প্রহরীর মতো দাঁড়িয়ে আছে শস্যসম্ভারকে আগলে। বাঁধের উপর দিয়ে যাবার সময়ে বাম দিকে দৃষ্টিপাত করলে চোখে পড়ে ভাদ্র মাসের পূর্ণাবয়ব রূপ-নারায়ণের ভৈরব মূর্তি। সবেগে সোচ্ছ্বাসে সফেন ঘোলাজলের আবর্তের লাট্টু ঘোরাতে ঘোরাতে এগিয়ে চলেছে অদূরবর্তিনী ভাগীরথীর অঙ্গে নিজ দেহ মিলিত করবার আগ্রহে।

শরৎচন্দ্রের গৃহের নিকটে পৌঁছে পালকি-বেহারারা পথের উপর পালকি নামালে,—একেবারে শরৎচন্দ্রের গৃহদ্বার পর্যন্ত পালকি নিয়ে যাবার মতো পথ নেই। পালকি থেকে নিক্রান্ত হয়ে পাঁচ সিকা ভাড়া চুকিয়ে দিয়ে অতি সন্তর্পণে একটা বাঁশের পুল অবলম্বন ক'রে নালা পার হয়ে শরৎচন্দ্রের গৃহে উপনীত হলাম। বেলা তখন দশটার কাছাকাছি।

বহির্বাটীর বারান্দায় একটা ঈজি-চেয়ারে অর্ধশায়িত অবস্থায় অবস্থান ক'রে শরৎ তখন একটা বই পড়ছে। বারান্দার সম্মুখে আমি উপস্থিত হতে, আমার পদশব্দেই বোধ হয় সচেতন হয়ে, বই সরিয়ে আমার প্রতি একবার দৃষ্টিপাত ক'রেই পুনরায় পূর্ববৎ মুখের সামনে বই রেখে পড়তে আরম্ভ করলে।

কি ব্যাপার! যে [illegible] আমাকে দেখলে সব কাজ ফেলে উৎফুল্ল হয়ে ওঠে, তার এ কি ভঙ্গী! উপেক্ষা না-কি? কিন্তু উপেক্ষারই বা কি কারণ থাকতে পারে? ভাবলাম, হয়তো একটা অত্যন্ত কৌতূহলো-

দ্দীপক বাক্যের মাঝামাঝি স্থানে রয়েছে, সেইটে শেষ ক'রে নিশ্চিন্ত হয়ে কথাবার্তা আরম্ভ করবে।

বারান্দায় উঠে একটা চেয়ারে উপবেশন ক'রে জিজ্ঞাসা করলাম, "কেমন আছ শরৎ?"

ঠিক একই ভাবে বই-ঢাকা মুখে অবস্থান ক'রে অনাগ্রহের সুরে শরৎ বললে, "ওই আছি।"

বললাম, "আছ, তা তো স্বচক্ষেই দেখছি। কেমন আছ, তাই জিজ্ঞাসা করছি।"

সে কথার কোনো উত্তর না দিয়ে শরৎ প্রশ্ন করলে, "ভাগলপুর থেকে কবে এলে?"

বললাম, "চার-পাঁচ দিন হ'ল। আমার চিঠির উত্তর দিলে না কেন?"

"কি আবার উত্তর দোব?"

শরতের উত্তর-প্রত্যুত্তরে উত্তরোত্তর বিস্মিত হচ্ছিলাম। ব্যাপারটার মধ্যে কৌতুকের কোনো স্থান আছে কি-না পরীক্ষা ক'রে দেখবার উদ্দেশ্যে মৃদু হাস্য ক'রে বললাম, "উত্তর দেবে—তোমার চিঠি পেয়ে যৎ-পরোনাস্তি খুশি হয়ে উপন্যাস লিখতে বসেছি; এক সংখ্যার মতো হ'লেই পাঠিয়ে দোব।"

শরৎ ধীরে ধীরে বইখানা বন্ধ ক'রে পাশের টেবিলের উপর রাখলে, তার পর সোজা হয়ে উঠে ব'সে তীক্ষ্ণ কুঞ্চিত নেত্রে আমার প্রতি দৃষ্টিপাত ক'রে বললে, "সেই কয়লাবালার ছেলের কাগজে আমাকে উপন্যাস লিখতে বল?"

সে কি ভয়ানক ফোঁস! যেন গোখরো সাপের লেজে পা দিয়েছি! কিন্তু সত্যি সত্যিই তো দিই নি। তাই এই অপ্ররোচিত অকারণ

ফোঁসের বিরুদ্ধে আমার অন্তরস্থ অভিমানও ফোঁস ক'রে উঠল। ঠিক একই রকম তীক্ষ্ণ নেত্রে দৃষ্টিপাত ক'রে বললাম, "কয়লাওয়ালা কে? যোগীন মুখুজ্জে?"

শরৎ বললে, "তা নয় তো আবার কে?"

বললাম, "কয়লাওয়ালার ছেলে আমার জামাই, তা জান?"

শরৎ বললে, "তা জানি আর নাই জানি, আমি ওদের কাগজে লেখা দোব না।"

বললাম, "কয়লাওয়ালা ইহলোকে এখন আর নেই, তা তুমি জান?"

শরৎ এ কথার কোনও উত্তর দিলে না। 'কয়লাওয়ালার ছেলে' কথা থেকে বুঝতে পেরেছিলাম, তার আসল রাগ কয়লাওয়ালার ওপর। একবার ইচ্ছা হ'ল, জিজ্ঞাসা করি—কয়লাওয়ালার কি অপরাধ? কিন্তু মনের মধ্যে যে দুর্বার অভিমান রুদ্ধ রোষে তড়পাচ্ছিল, সে ফোঁস ক'রে উঠে বললে, খবরদার না, কোনো-রকম বোঝা-পড়ার চেষ্টা দেখিয়ে নিজেকে হালকা ক'রো না। মনে মনে বললাম, তবে রইলে তুমি শরৎচন্দ্র তোমার সামতাবেড়ে, রইল তোমার উপন্যাস আর গল্প। একবার দেখাই যাক, তোমাকে বাদ দিয়ে মাসিকপত্র বার করতে পারি কি-না!

ভালবাসা যেখানে পর্যাপ্ত, প্রত্যাশা সেখানে অসঙ্গত নয়; দাবি যেখানে অনস্বীকার্য, অভিমান সেখানে কঠিন ভূমির শিকড়ের ন্যায়, দূরপনেয় বস্তু। শরৎ যদি আমার আত্মীয় না হ'ত, বন্ধু না হ'ত, আমাদের উভয়ের মধ্যে যদি প্রীতির একটা সহজ এবং সুদৃঢ় বন্ধন না থাকত, তা হ'লে হয়তো তার সঙ্গে তর্ক-বিতর্ক ঝগড়াঝাঁটি ক'রে যা-হয় একটা মিটমাট ক'রে নিতে পারতাম। কিন্তু এ ক্ষেত্রে একমাত্র যে কাজ করা যেতে পারে তাই করলাম;—উঠে দাঁড়ালাম।

শরৎ বললে, "কোথায় যাচ্ছ ?"

বললাম, "বাড়ি।"

ঈষৎ বিস্ময়ের স্বরে শরৎ বললে, "বাড়ি মানে ?"

"বাড়ি মানে, কলকাতা বাগবাজার স্ট্রীটের বাড়ি।"

এক মুহূর্ত মনে মনে কি ভেবে শরৎ বললে, "খাওয়া-দাওয়া ক'রে যেয়ো।"

মুখ অবশ্য উচ্ছ্বসিতই হয়ে ছিল; সেই উচ্ছ্বসিত মুখে অল্প একটু হাসি হেসে বললাম, "এই কেতাবওয়ালার বাড়িতে খাওয়া-দাওয়া করতে তুমি আমাকে বল ?"

'কয়লাবালার' উত্তরে এত কঠিন পাল্টার জন্য শরৎ নিশ্চয়ই প্রস্তুত ছিল না। সে এ কথার কোনো উত্তর দিতে পারলে না অথবা ইচ্ছে ক'রেই দিলে না। মুখটা কিন্তু একটু কঠিন ও আরক্ত হয়ে উঠল; বললে, "অনেকটা পথ এসেছ, যেতে হবে অনেকটা পথ,—অন্তত চা-খাবার খেয়ে যাও।"

এবার আর উচ্ছ্বসিত মুখে হাসলাম না, কতকটা সহজ হাসি হেসেই বললাম, "ডাল-ভাত খেতে চাচ্ছি নে অক্ষিধের জন্যে তো নয় যে, চা-খাবার খেতে আপত্তি না হতেও পারে। কানমলা খেলাম না, কিন্তু চড়-চাপড় খেয়ে যাব, সে কি কোনো কাজের কথা হ'ল ?"

বারান্দা থেকে উঠানে নেমে এলাম। না খেয়ে চ'লে যাচ্ছি, সে জন্য শরৎ হয়তো মনে মনে একটু দুঃখিত হয়েছিল। আমার সঙ্গে সঙ্গে নেমে এসে সে বললে, "তুমি রাগ করছ উপীন।"

বললাম, "তা হয়তো করছি, কিন্তু অকারণে করছি নে।" শরতের কম্পাউণ্ড ছেড়ে বেরিয়ে এলাম। শরৎ বোধ হয় একবার শেষ চেষ্টা করলে; বললে, "অন্যায় ক'রে যাচ্ছ তুমি।"

ফিরে দাঁড়িয়ে বললাম, "অন্যায় ক'রে যাচ্ছি, না, অন্যায় পেয়ে যাচ্ছি— সে বিচার ভবিষ্যতে হয়তো একদিন হতে পারবে।"

শরৎ বললে, "তা হ'লে ভবিষ্যতের দিকেই চেয়ে ব'সে থাকা যাক।"

এর বেশি শরতের পক্ষে আর কিছু করবার উপায় ছিল না। সে বুঝেছিল, আমাকে তার বাড়িতে অন্ন গ্রহণ করাবার যদি কোনো উপায় থাকে তো একমাত্র তা ছিল আমার কাগজে লেখা দিতে প্রতিশ্রুতি হয়ে। কিন্তু এতটা মচকাতে সে হয়তো নিজের কাছে একটু অসুবিধা বোধ করছিল। আমি কিন্তু তাকে এই অসুবিধার অবস্থা হতে মুক্তি দেবার অভিপ্রায়ে আর কোনো কথা না ব'লে স'রে পড়লাম। মনে মনে ভাবলাম, সে আমার পথ বন্ধ করলে, কিন্তু আমি তো তার পথ বন্ধ করি নি ; যদি কোনো দিন তার মনে হয়, সে ভুল করেছিল, তা হ'লে সে আমার কাছে উপস্থিতও হতে পারে, চিঠি লিখতেও পারে।

দীর্ঘকাল পরে একদিন অবশ্য তার ভুল ভেঙেছিল। সেদিন কিন্তু সে আমার কাছে উপস্থিত হয় নি, চিঠিও লেখে নি ; করেছিল ফোন। আর ফোনের মাধ্যমে কথোপকথনের মধ্যে চক্ষুলজ্জার তেমন বালাই থাকে না ব'লে বহুদিনকার বিবাদ এক নিমেষে মিটে গিয়েছিল।

কোন্ ভুলের বশবর্তী হয়ে শরতের কাছে কয়লা-খনির মালিক কয়লাওয়ালা হয়েছিলেন, এবং কেমন ক'রে তেমন ভুল হতে পেরেছিল, তার সন্ধান পাই সুপ্রসিদ্ধ সাহিত্যিক সুরেনদাদার কাছে। যথাকালে সে সকল কথা প্রকাশ ক'রে বলব।

সেদিন কলিকাতা প্রত্যাবর্তনের পথে ট্রেনে ব'সে প্রতিজ্ঞা করেছিলাম, কাগজ যদি বার করতে পারি তো খুঁজে পেতে অখ্যাত শক্তিশালী লেখক বার করব ; যদি প্রয়োজন হয়, তাদের দ্বারস্থও হব ; কিন্তু প্রাচীন প্রতিষ্ঠাবানের দ্বারে সাধ্যমতো আর নয়।

সামতাবেড় থেকে সুসংবাদ নিয়ে ফিরব - এ বিশ্বাস সকলেরই ছিল। তাই কলিকাতায় ফিরে এসে যখন জানালাম—শরতের লেখা পাওয়া যাবে না, তখন সকলে দুঃখিত যত না হ'ল বিস্মিত হ'ল তার অনেক বেশি।

কি কারণে শরতের লেখা পাওয়া সম্ভব হ'ল না, তদ্বিষয়ে সকলের কৌতূহল এড়িয়ে যাবার জন্য অবান্তর ও অস্পষ্ট উত্তর দিতে লাগলাম, শরৎ-বৃক্ষে আমাদের কাগজের জন্য ফুলই এখনো ফোটে নি তো ফল পাব কেমন ক'রে ? কাউকে বললাম, আমরা যদি চন্দ্র-সূর্য দুই জ্যোতিষ্কই অধিকার ক'রে বসি, তা হ'লে অন্য সব কাগজ যে অন্ধকার হয়ে যাবে। কিন্তু বৃষ্টিহীন শরৎ-আকাশের শুধু মেঘ-গর্জনই শুনে এসেছি, সেই বেদনাদায়ক আসল কথা কাউকে বললাম না।

আমার জামাতা সুশীল জিজ্ঞাসা করলেন, "ওর লেখার জন্যে উপযুক্ত দক্ষিণা দেওয়া হবে - সে কথা ওঁকে বলেছিলেন ?"

বললাম, "ভাগলপুর থেকে যে চিঠি ওকে লিখেছিলাম, তাতে সে কথা সুস্পষ্ট ভাষায় জানিয়েছিলাম। এবার কিন্তু সে কথা তুললে অবান্তর কথা তোলা হ'ত।"

কৌতূহল বোধ হয় সুশীলকে থামতে দিচ্ছিল না; বললেন, "তবে রাজী না হওয়ার কারণ কি ?"

হাসিমুখে বললাম, "কারণটা আপাতত শুধু আমারই জানা থাক্। তোমাদের শুনে কাজ নেই।"

এ উত্তরের পর সুশীল আর কোনো প্রশ্ন করলেন না। কলিকাতার কাজ শেষ ক'রে তিন-চার দিনের মধ্যে ভাগলপুর ফিরে গেলাম।

শরতের কাছে ধাক্কা খেয়ে এসে আগ্রহের বেগ এবং কাজ করবার শক্তি বেশ একটু বেড়ে উঠল। কাগজ বার করবার চিন্তা কল্পনা আর ধ্যানে মশগুল হয়ে উঠলাম। নদী যখন গতি পরিবর্তন করে, তখন যেমন তার সমগ্র জলরাশি এক কূলের দিকে স'রে আসে আর অপর কূলের দিকে চড়া পড়তে আরম্ভ করে, আমার মনের ভিতরকার অবস্থাও হ'ল ঠিক সেই রকম। সমস্ত আগ্রহ এবং উদ্যম প্রবাহিত হ'ল কাগজ বার করবার কূলের দিকে; ওদিকে ওকালতির কূলে চড়া পড়তে লাগল। নূতন কাজের জন্যে উৎসুক চিত্তে অপেক্ষা করি নে; হাতের পুরাতন কাজ গুটিয়ে ফেলতে পারলেই খুশি হই। মক্কেল ঘরে প্রবেশ করলে অনাগ্রহের সুরে বলি, আইয়ে; বনিবনা না হ'লে দুঃখিত না হয়ে নমস্কার ক'রে সেই একই কথা উচ্চারিত করি, আইয়ে। নোঙর তোলবার সময় যখন আসন্ন, তখন আর নূতন খোঁটায় কাছি বেঁধে লাভ কি? কলিকাতায় যাওয়া-আসা ঘন ঘন হতে লাগল। তার ফলে ক্রমশ বুঝতে পারলাম, ফাল্গুন মাসে কাগজ বার করতে পারা যাবে না। মাস দুই পেছিয়ে দিয়ে ১৩৩৪ সালের পয়লা বৈশাখ, অর্থাৎ একেবারে নববর্ষের প্রথম দিন, বার করাই স্থির করলাম।

বড়দিনের ছুটিতে কলিকাতা হাইকোর্ট বন্ধ হ'লে শ্রীযুক্ত যতিনাথ ঘোষ ভাগলপুরে এলেন। যতিনাথরা তখন ভাগলপুরে বাস করেন; কলিকাতায় অবস্থান ক'রে শুধু যতিনাথ করেন হাইকোর্টে ওকালতি। প্রতি বৎসর তিনি নিয়মিতভাবে শারদীয় পূজোর ছুটি উপলক্ষে ভাগলপুরে এসে অবসরকাল অতিবাহিত ক'রে যান।

যতিনাথকে ভাগলপুরে পেয়ে খুশি হলাম। খুশি হওয়ার দুটি কারণ ছিল। প্রথমত, যতিনাথ কলিকাতায় থাকেন ব'লে স্থায়িভাবে আমি তথায় না যাওয়া পর্যন্ত তাঁর দ্বারা কলিকাতার সাহিত্যিক মহলে

কিছু কিছু প্রচারকার্য চালানো হয়তো সম্ভব হতে পারে; এবং দ্বিতীয়ত, যতিনাথের সাহিত্যবোধ এবং সাহিত্যরুচির প্রতি আমার বিশেষ আস্থা থাকায় মাসিকপত্রের পরিকল্পনা এবং অভ্যন্তরীণ গঠন-কার্যের বিষয়ে তার কাছ থেকে মূল্যবান পরামর্শ লাভের প্রত্যাশা করতে পারি।

বাংলা দেশের পাঠক-সমাজে যতিনাথ ঘোষ পরিচিত ব্যক্তি নন, এ কথা স্বীকার করি। কিন্তু লেখক হিসাবে অপরিচিত এই আত্মপ্রবিষ্ট স্বল্পবন্ধু মানুষটির সহিত যাঁরা অন্তরঙ্গ তাঁরা জানেন, বাংলা দেশের পাঠক-সমাজে এমন নিষ্ঠাবান পাঠকও খুব বেশি নেই। এ কথা শুধু বাংলা-সাহিত্যের সম্পর্কেই বলছি নে, ইংরেজী সাহিত্যের সম্পর্কে এ কথা বোধ করি সমধিক মাত্রায় বলা যেতে পারে। যতিনাথ যদি সাহিত্যের শুধু খরিদ্দারই না হতেন, তা হ'লে আমার বিশ্বাস, তার নিজের সাহিত্যের খরিদ্দারও অল্প হ'ত না।

আমি কাগজ বার করছি অবগত হয়ে যতিনাথ অতিশয় আনন্দিত হলেন এবং সে বিষয়ে তাঁর পরিপূর্ণ সহযোগিতার প্রতিশ্রুতি দিলেন। প্রতিদিন বৈকালে আমাদের বৈঠক বসতে লাগল ভাগীরথীতীরে বন্ধুবর অমরেন্দ্রনাথের গৃহে। সেখানে নানা কল্পনা-জল্পনায় নানা তর্কে-বিতর্কে আসর সরগরম হয়ে ওঠে। একটা প্রদীপ্ত উৎসাহ এবং উদ্দীপনার মধ্য দিয়ে বড়দিনের ছুটি দেখতে দেখতে শেষ হয়ে গেল; যতিনাথও কলিকাতায় ফিরে গেলেন।

তার কিছুদিন পরেই আমি কলিকাতায় উপস্থিত হলাম।

'ওমর খৈয়াম' অনুবাদ-কাব্যের সুপ্রসিদ্ধ কবি কান্তিচন্দ্র ঘোষ তখন শ্যামবাজার ডাকঘরের খানিকটা উত্তরে কর্নওয়ালিশ স্ট্রীটের উপর তাঁদের পৈতৃক গৃহে বাস করতেন। তিনি যতিনাথের অন্তরঙ্গ বন্ধু এবং আমার

সহপাঠী ও বন্ধু যোগেশচন্দ্র ঘোষের সহোদর। একদিন সকালে যতিনাথের সহিত কান্তিবাবুর গৃহে উপস্থিত হলাম। কান্তিবাবু তখন বাড়ি ছিলেন না, কোথাও বেরিয়েছেন। যতিনাথ বললেন, "কোথাও—অন্য কোথাও নয়, নিশ্চয়ই অমলবাবুর বাড়ি। সেখানে চলুন, সেখানে দুজনের সঙ্গেই দেখা হবে।"

অমল অর্থে পশ্চিমবঙ্গ সরকারের ভূতপূর্ব প্রচার-নায়ক শ্রীযুত অমল হোম। সে সময়ে তিনি সবিশেষ দক্ষতার সঙ্গে 'ক্যালকাটা মিউনিসিপ্যাল গেজেট'-এর সম্পাদন করছেন।

যতিনাথের অনুমান ভুল হয় নি, অমলবাবুর গৃহে উপস্থিত হয়ে দেখলাম, কান্তিবাবু তথায় অবস্থান করছেন। পীতনিঃশেষিত চায়ের শূন্য কয়েকটি পেয়ালা তখনো টেবিলের মায়া কাটাতে পারে নি। ক্ষণকাল পূর্বে যে মুখগুলির চুম্বনে চুম্বনে তারা সর্বস্বান্ত হয়েছে, বাক্যমুখর সেই মুখগুলিরই প্রতি তাকিয়ে তাকিয়ে তারা অবহেলার দুঃখ পরিপাক করছে। আমরা দুজনে গিয়ে বসতেই লজ্জা পেয়ে তারা স'রে পড়ল। কিন্তু অল্পক্ষণ পরে হয়তো তারাই সুতপ্ত চম্পকবর্ণের পরিপূর্ণতা নিয়ে পুনরাবির্ভূত হয়ে আমাদের ওষ্ঠাধরকে প্রলুব্ধ ক'রে তুললে। উৎকৃষ্ট চা-পান করতে করতে কথোপকথনে প্রবৃত্ত হলাম।

'সবিতা' নাম সকলেরই ভাল লাগল। বিশেষত ঐ নাম সম্বন্ধে রবীন্দ্রনাথের অপছন্দ না হওয়ার সার্টিফিকেট যখন পেশ করলাম, তখন আর কেউই অপছন্দ করতে সাহস করলে না।

কান্তিবাবুর অফিস আছে, যতিনাথের আদালত; কাজেই সেদিন-কার সকালবেলার বৈঠক অধিকক্ষণ স্থায়ী হতে পারলে না। কান্তিবাবু, যতিনাথ ও আমি বেরিয়ে পড়লাম।

এর পর থেকে প্রত্যহ আমাদের চারজনের বৈঠক বসতে লাগল; হয়

ভাবে প্রযোজ্য ব'লে মনে হ'ত। প্রার্থনার ডালি নিয়ে আমরা তাঁর কাছে উপস্থিত হতাম, তিনি তাঁর থলি উজাড় ক'রে আমাদের ডালি ভ'রে দিয়ে নিঃস্ব হতেন। কবিতা, উপন্যাস, প্রবন্ধ, পত্রাবলী, স্বরলিপিতে 'বিচিত্রা'র ডালি সত্যই বিচিত্র হয়ে উঠত। কোনো মাসিকপত্রের পক্ষে রবীন্দ্রনাথের একটি কবিতা পাওয়াই সৌভাগ্যের কথা; আমরা এক-এক বারে পাঁচটা ছটা, এমন কি কখনো-সখনো আটটা নটা কবিতা নিয়ে ফিরতাম।

কিন্তু এই অপর্যাপ্ত প্রাপ্তিকে সামলে পরিপাক করার মধ্যে সময়ে সময়ে বেশ একটু কৌতুকাবহ সঙ্কটও ভোগ করতে হ'ত। হয়তো রবীন্দ্রনাথ একেবারে গোটা ছয়েক কবিতা দিয়ে দিয়েছেন। মনে মনে এই সিদ্ধান্ত ক'রে আশ্বস্ত হলাম যে, প্রতি সংখ্যা একটি কবিতা দিয়ে আরম্ভ করলে মাস ছয়েকের জন্য এখন নিশ্চিন্ত,—এর মধ্যে কোনো সংখ্যার রবীন্দ্রকাব্যহীন হয়ে প্রকাশিত হবার দুর্ভাগ্য ভোগ করতে হবে না। সেই মতলব ক'রে পরবর্তী সংখ্যায় একটিমাত্র কবিতা প্রকাশিত করলাম। হাতে রাখলাম পাঁচটি।

'বিচিত্রা'র জন্য রবীন্দ্রনাথ একটু ঔৎসুক্যের সহিত অপেক্ষা ক'রে থাকতেন। তিনি কলিকাতায় থাকলে 'বিচিত্রা' প্রকাশিত হওয়া মাত্র আমি নিজে গিয়ে তাঁকে কাগজ দিয়ে আসতাম। তদনুসারে 'বিচিত্রা' নিয়ে গিয়েছি। আমার হাত থেকে 'বিচিত্রা' নিয়ে উল্টে-পাল্টে দেখে দেখলেন, তাঁর ছটি কবিতার মধ্যে মাত্র একটি প্রকাশিত হয়েছে। কিন্তু তদ্বিষয়ে কোনো মন্তব্য করলেন না। তাঁর অপরাপর লেখাগুলির প্রতি মনোযোগী হলেন।

পরের সংখ্যাতেও সেই একই কাহিনী। বইখানা উল্টে-পাল্টে দেখে রবীন্দ্রনাথ বুঝলেন, তখনো আমার হাতে তাঁর খান চারেক কবিতা

মজুত ; প্রথম বিষয়বস্তু হিসাবে সেবারের 'বিচিত্রা'য় মাত্র একটি কবিতা প্রকাশিত হয়েছে।

এবার আর রবীন্দ্রনাথ অপরাধ ক্ষমা ক'রে নীরবে থাকলেন না ; কুঞ্চিতস্মিত চক্ষে আমার প্রতি দৃষ্টিপাত ক'রে বললেন, "দেখ উপেন, কৃপণতা কোনো ক্ষেত্রেই ভাল নয় ; কবিতা প্রকাশ করার ক্ষেত্রেও নয়। আচ্ছা, তুমি কি মনে করেছ আমার কাব্যের উৎস শুকিয়ে গেছে, তাই একটি একটি ক'রে কবিতা ছাপছ ?"

ভাল ! কর্তার ইচ্ছায় কর্ম ! পরের বারে একেবারে দুটো কবিতা হয়তো বা গোটা তিনেকই বার ক'রে দিলাম। কাগজ পেয়ে উল্টে-পাল্টে দেখে আমার প্রতি দৃষ্টিপাত ক'রে পুনরায় সেই কুঞ্চিত চক্ষের হাসি।—"ওহে উপেন, প্রাচুর্যের দিনে পেট ভ'রে খাচ্ছ, অনটনের দিনে কিন্তু অনাহারে শুকোতে হবে। তুমি কি মনে কর, আমি পাকা ফলের গাছ যে, নাড়া দিলেই ফল পড়বে ?"

মনে মনে বললাম, মশায়, এগোলেও আপনার যে কথা, পেছলেও তাই—এখন যাই কোন্ দিকে বলুন তো ?" মুখে কিন্তু কোনো কথা না ব'লে শুধু একটু হাসলাম।

বলা বাহুল্য, রবীন্দ্রনাথের উল্লিখিত উক্তি দুটিই বিশুদ্ধ কৌতুকরস-প্রণোদিত। তা হ'লেও আমার প্রত্যক্ষ পর্যবেক্ষণের অভিজ্ঞতা থেকে এ কথা অসংশয়ে বলতে পারি, মোটের উপর লেখা প্রকাশিত হ'লেই তিনি খুশ হতেন। লেখা শেষ ক'রে বাক্সয় চাবি দিয়ে বন্দী ক'রে রাখা তিনি আদৌ পছন্দ করতেন না। কারণ, তিনি লিখতেন দুটি স্বতন্ত্র পক্ষকে আনন্দ দান করবার উদ্দেশ্যে। প্রথম পক্ষ অবশ্য একমাত্র তিনি নিজে ; দ্বিতীয় পক্ষ নিজেকে বাদ দিয়ে বিশ্ব-মানবসমাজ। নিজেকে আনন্দ দানের নগদ-বিদায় চলতে থাকত লেখার সঙ্গে সঙ্গে ;

কিন্তু লেখা শেষ হ'লে রবীন্দ্রনাথ সে লেখা দ্বিতীয় পক্ষ অর্থাৎ বিশ্ব-মানবের দরবারে ছড়িয়ে দেবার জন্যে ব্যস্ত হয়ে উঠতেন, যেমন ব্যস্ত হয়ে ওঠে বিকশিত হওয়া মাত্র গাছের ফুল আকাশের দরবারে গন্ধ ছড়িয়ে দেবার জন্যে। দিন ও সময় স্থির ক'রে আমন্ত্রণ পাঠিয়ে রবীন্দ্রনাথ আত্মীয়স্বজন ও অনুরাগী পাঠকবর্গকে পারিবারিক বৈঠকে আহূত ক'রে এনে তাঁর সদ্যোজাত রচনা পাঠ ক'রে শোনাতেন। তার পর সাধারণ সমাজে বিতরিত হবার জন্য পাঠিয়ে দিতেন ছাপাখানায়।

ফুলের গন্ধের সহিত রবীন্দ্রনাথের রচনার তুলনা করেছি। কিন্তু এই দুই বস্তুর প্রকাশ-প্রণালীর মধ্যে পার্থক্যও কিছু ছিল। ফুল প্রস্ফুটিত হ'লে তার ভিতর হতে গন্ধ স্বতই নিষ্ক্রান্ত হয়ে আসে,—কারো কাছ থেকে তাকে কোনো মঞ্জুরি নিয়ে আসতে হয় না। রবীন্দ্র-রচনার কিন্তু সে উপায় ছিল না। রবীন্দ্রনাথের অন্তর্নিবাসী কড়া যাচাইকারের কাছে শ্রেষ্ঠতার ছাড়পত্র পেলে তবেই সে রচনা বহির্জগতে আত্মপ্রকাশ করতে সক্ষম হ'ত। রবীন্দ্রনাথ লিখতেন, আর সেই কঠোর যাচাইকার সে লেখা কেটে-কুটে ছেঁটে-ছুটে কমিয়ে-বাড়িয়ে একশা ক'রে দিত। রবীন্দ্রনাথের পাণ্ডুলিপি দেখবার যাঁদের সুযোগ হয়েছে তাঁদের কাছে যাচাইকারের এই কাটাকুটির কীর্তি অবিদিত নেই।

কিন্তু এর পরও সব সময়ে তিনি নিশ্চিন্ত থাকতে পারতেন না, সময়ে সময়ে মনের মধ্যে সংশয়ের পীড়া অনুভব করতেন। আমি এক-আধ বার তার প্রমাণ পেয়েছিলাম।

হিবার্ট লেক্‌চার দিতে রবীন্দ্রনাথ বিদেশে যাবেন,—তখন 'বিচিত্রা'য় তাঁর ধারাবাহিক উপন্যাস "যোগাযোগ" মাসে মাসে প্রকাশিত হচ্ছে। শান্তিনিকেতন থেকে রবীন্দ্রনাথ আমাকে চিঠি লিখলেন, "'যোগাযোগে'র

ধারাবাহিকতা 'বিচিত্রা'য় নষ্ট হয়, তা আমি চাই নে। আমি উপন্যাসের অনেকখানি লিখে ফেলেছি, তুমি একজন লেখক নিয়ে এখানে চ'লে এসে কপি করিয়ে নাও। তাতে কয়েক মাস চলবে। তার পর আমি পথ থেকে ও বিদেশ থেকে লিখে লিখে পাঠাব।"

চিঠি পাওয়া মাত্র আমি বিনোদবিহারী গুপ্ত নামে আমাদের একজন কর্মচারীকে সঙ্গে নিয়ে শান্তিনিকেতনে উপস্থিত হলাম। বিনোদবাবু 'পুরাতন প্রসঙ্গ'-লেখক অধ্যাপক বিপিনবিহারী গুপ্তের কনিষ্ঠ সহোদর। ঘাড় গুঁজে নিবিষ্ট চিত্তে বিনোদবাবু 'যোগাযোগ' নকল ক'রে চলেন ; আমি ঘুরে-ফিরে বেড়াই। কখনো দিনুবাবুর (দিনেন্দ্রনাথ ঠাকুরের) গৃহে গিয়ে আড্ডা জমাই, কখনো চিত্রশালায় গিয়ে ছবি দেখি, কখনো বা গুরুপল্লীতে শ্রীযুত নন্দলাল বসুর গৃহে উপস্থিত হয়ে চিত্রশিল্প বিষয়ে বিতর্ক তুলি। তা ছাড়া প্রধান কার্য হ'ল সকাল-সন্ধ্যা উত্তরায়ণে গিয়ে কবিগুরুর সভায় হাজিরা দেওয়া এবং মধ্যাহ্নে ও রাত্রে তাঁর সহিত আহার করা।

গেস্ট হাউসে একটি আরামদায়ক কামরা দখল ক'রে আছি। প্রত্যুষে উঠে মুখ হাত ধুয়ে চা-পান ক'রে উত্তরায়ণের উদ্দেশ্যে বেরিয়ে পড়ি। ততক্ষণে কাজ-পাগলা বিনোদবাবু টেবিলের উপর ঘাড় গুঁজে 'যোগাযোগ' কপি করতে ব'সে গেছেন। কানে কম শোনেন, সেই জন্যে তাঁর সঙ্গে কম কথাবার্তা কওয়া আরামদায়ক। তাড়াতাড়ি পথে বেরিয়ে পড়ি। খানিকটা এদিক ওদিক ঘুরে উত্তরায়ণে যখন উপস্থিত হই, তখন কবির দরবার পুরোদমে চলছে।

আমি ছাড়া প্রায় সকলেই স্থানীয় অধিবাসী, সুতরাং সকলেরই কাজ-কর্ম আছে, বেলা নটা সাড়ে নটা বাজতে-না-বাজতে সবাই উঠে পড়েন। আমি তখন জাঁকিয়ে বসি। বাল্যকাল থেকে চিরটা কাল আড্ডা

দেওয়ার সাধনা করেছি, সুতরাং আড্ডা দেওয়ার সুষ্ঠু প্রণালী কতকটা জানা আছে ; আর, রবীন্দ্রনাথের কোন্ প্রণালী যে অজানা আছে, তা তো জানি নে। কথায় কথায় আড্ডা জ'মে ওঠে।

হঠাৎ এক সময়ে রবীন্দ্রনাথ বলেন, "ওহে, একটা কবিতা লিখেছি। প'ড়ে দেখ তো কেমন হয়েছে!" ব'লে কবিতাটা আমার হাতে দেন।

আগ্রহসহকারে আমি কবিতা পাঠ করতে থাকি ; আর, কবিতা আমার ভাল লাগছে অথবা লাগছে না অনুমান করবার উদ্দেশ্যে আগ্রহ-সহকারে রবীন্দ্রনাথ আমার মুখের রেখা পাঠ করতে থাকেন। অপাঙ্গে দৃষ্টিপাত ক'রে মাঝে মাঝে আমি তা দেখতে পাই।

পড়া শেষ হ'লে ঔৎসুক্যের সহিত রবীন্দ্রনাথ জিজ্ঞাসা করেন, "কি হে, কেমন হয়েছে? চলবে তো?"

রবীন্দ্রনাথের হাতে কবিতা ফিরিয়ে দিয়ে বলি, "চমৎকার হয়েছে।"

কোনো দিন বা ঐ একই প্রশ্নের উত্তরে বলি, "খাসা হয়েছে।"

একদিন কিন্তু ঐ ধরনের প্রশ্নের উত্তরে কৌতুকের বশবর্তী হয়ে ব'লে ফেললাম, "আজ্ঞে না, চলবে না। এ একদম অচল।"

রবীন্দ্রনাথ কোনো উত্তর দিলেন না, শুধু নিঃশব্দ হাস্যে তাঁর সমস্ত মুখ আরক্ত হয়ে উঠল। এর পরও তিনি আমাকে কবিতা পড়তে দিতেন, কিন্তু পাছে আবার বলি 'একদম অচল'—সেই ভয়ে সচল-অচলের প্রশ্ন আর তুলতেন না।

নিজের সৃষ্টির বিষয়ে এই যে সংশয়, বস্তুত এ কোনো স্বতন্ত্র ব্যাপার নয়। উৎকৃষ্টকে উৎকৃষ্টতর ক'রে তোলবার জন্য রবীন্দ্রনাথের মনের মধ্যে একটা যে অনিবার ব্যাকুলতা ছিল, এ তারই এক দিকের বহিঃ-প্রতিক্রিয়া মাত্র। নিজের যাচাই শেষ হওয়ার পরও অপরকে দিয়ে যাচাই করিয়ে নেবার আগ্রহ।

বিনোদবাবুর নিকট হতে 'যোগাযোগে'র কপি নিয়ে দেখতাম, জায়গায় জায়গায় রবীন্দ্রনাথ পাতার পর পাতা কেটে বাদ দিয়েছেন। বৃহৎ আকারের পাতা—লাইনে লাইনে অক্ষরে অক্ষরে কাটা সম্ভব নয়, ওপর-নীচে দীর্ঘ লাইন চালিয়ে কেটেছেন। প'ড়ে দেখতাম, একেবারে প্রথম শ্রেণীর সাহিত্য। এতখানি উৎকৃষ্ট বস্তু থেকে আমার 'বিচিত্রা' বঞ্চিত হচ্ছে দেখে মনটা 'হায় হায়' ক'রে উঠত। রবীন্দ্রনাথের কাছে অনুযোগ করতাম। তিনি হেসে বলতেন, "না হে, ও ঠিকই করেছি। পরে বুঝতে পারবে।"

পরে বুঝতে পারবার আশ্বাসে হালফিলের ক্ষতিকে পরিপাক করা কঠিন হ'ত।

তা কঠিন হোক, এদিকে কিন্তু দেখছি অজ্ঞাতে-অগোচরে রাম না জন্মাতেই রামায়ণ লিখতে আরম্ভ ক'রে দিয়েছি। 'বিচিত্রা' আরম্ভ হতে এখনো চার-পাঁচ মাস কাল বাকি, এরই মধ্যে 'বিচিত্রা'র খানিকটা এগিয়ে যাওয়ার সময়ের কথা লেখা আরম্ভ হয়ে গেছে।

সুতরাং যা বলছিলাম, তা-ই উপস্থিত বলি।

দুটি বিষয়ে স্থির-সিদ্ধান্তে উপনীত হয়ে কতকটা হালকা নিশ্চিন্ত মন নিয়ে ভাগলপুরে প্রত্যাবর্তন করলাম। প্রথমত, মাসিকের নাম হ'ল 'বিচিত্রা'; আর দ্বিতীয়ত, ফাল্গুন মাসের পরিবর্তে 'বিচিত্রা'র প্রথম প্রকাশের তারিখ স্থির করলাম ১৩৩৪ সালের পয়লা আষাঢ়। দেখতে দেখতে ফাল্গুন মাস এতটা কাছিয়ে এসেছিল যে, সব রকম যোগাড়-যন্ত্র উদ্যোগ-আয়োজন শেষ ক'রে অত শীঘ্র কাগজ বার করা সম্ভব মনে হ'ল না।

ভাগলপুরে ভাগীরথীর তীরে উপবেশন ক'রে বন্ধুবর অমরেন্দ্রনাথ দাস ও আমি প্রায়ই একটা স্বপ্ন দেখতাম। স্বপ্নটা ছিল একটু বড় বহরের,—হিন্দু-মুসলমানের মিলন-সাধনের স্বপ্ন। জীবনের ক্রিয়াশীলতার বেশ-খানিকটা অংশ এই যৎপরোনাস্তি প্রয়োজনীয় কার্যে ব্যয়িত করবার আগ্রহে আমরা দুই বন্ধু উচ্ছল হয়ে উঠতাম। আমাদের সামর্থ্যের সঙ্কীর্ণতার বিষয়ে নিশ্চয়ই আমরা সচেতন ছিলাম; কিন্তু এ কথাও বিস্মৃত হতাম না, ক্ষীণতম সরিৎও তার অতি-সঙ্কীর্ণ জলপ্রবাহের দ্বারা বিশালকায় নদীকে খানিকটা বিশালতর ক'রে তুলতে পারে।

হিন্দু-মুসলমান-সংঘর্ষের যে দুরন্ত ঝটিকা স্বাধীনতা-অর্জনের অল্পকাল পূর্বে সারা ভারতবর্ষকে ভেঙে-চুরে দুমড়ে-মুচড়ে বিধ্বস্ত ক'রে দিয়েছিল এবং যার উদ্ধত রোষ এ পর্যন্ত সম্পূর্ণরূপে প্রশমিত হ'ল না, বিশ-বাইশ বৎসর পূর্বে তার মেঘসঞ্চয়ের উপক্রম-পর্ব লক্ষ্য ক'রে আমরা শঙ্কিত হয়ে উঠতাম,—আর স্বপ্ন দেখতাম, কি ক'রে এই ঝটিকার মেঘসঞ্চয়কে ফুৎকারে ফুৎকারে চূর্ণ ক'রে আকাশ থেকে উড়িয়ে দেওয়া যায়।

এই ফুৎকার অবশ্য প্রেমের ফুৎকার। আমাদের দেশ প্রেমের দেশ। এক সময়ে এই দেশে চৈতন্য মহাপ্রভু প্রেমের ফুৎকারে অনেক বৈষম্যের মেঘকে চূর্ণ ক'রে আকাশ নির্মল করেছিলেন। আমাদেরও সেইরকম সাধ যেত, কিন্তু সাধ্য খুঁজে পেতাম না।

অমরেন্দ্র বললেন, "এবার তো সাধ্য খানিকটা দেখা দিয়েছে, অস্ত্র পেয়েছেন। কলকাতায় গিয়ে কাজে লাগুন। সরকারী কাজ থেকে অবসর পাওয়ামাত্র আমি গিয়ে আপনার সঙ্গে যোগ দোব।"

বললাম, "সেই কথাই ভাল। 'বিচিত্রা'-লাঙ্গল দিয়ে আমি বিদ্বেষ-বিরোধের কণ্টকক্ষেত্র কর্ষিত ক'রে রাখিগে, তার পর আপনি গেলে দুজনে মিলে বীজবপনের কাজে লাগা যাবে।"

বীজবপনের কাজে শেষ পর্যন্ত কিন্তু আমাদের দুজনের মিলিত হওয়া সম্ভব হতে পারে নি। দুর্বার দৈব নির্মমভাবে অমরেন্দ্রনাথের কলিকাতায় যাবার পথ বন্ধ ক'রে দিয়েছিল। কিরূপে দিয়েছিল, সে অতি-করুণ কাহিনী অকথিত থাকাই ভাল।

ভূমিকর্ষণের কাজে অবশ্য আমি যথাশক্তি আত্মনিয়োগ করেছিলাম। সে বিষয়ে সভা-সমিতি করি নি, তর্ক-বিতর্ক চালাই নি, এমন কি, প্রবন্ধ লিখি নি অথবা লেখাই নি :—শুধু 'বিচিত্রা'র প্রাঙ্গণে প্রবেশের পথ হিন্দু-মুসলমান উভয় সম্প্রদায়ের পক্ষে একইভাবে সুগম করেছিলাম এবং একই প্রকারে উন্মুক্ত করেছিলাম। 'বিচিত্রা'কে করতে চেয়েছিলাম হিন্দু-মুসলমান লেখকের চিন্তা প্রেরণের এবং হিন্দু-মুসলমান পাঠকের চিন্তা গ্রহণের যন্ত্র, এবং সেই উপায়ে হিন্দু-মুসলমানের মননশীলতার ক্ষেত্রে একটা সাংস্কৃতিক একতার বীজ উৎপন্ন করতে কতকটা সক্ষমও হয়েছিলাম।

এ প্রণালী অবশ্য মন্থরগতির প্রণালী। এ প্রণালীর দ্বারা যা আসে

তা বিলম্বিত পদে এবং স্বল্প পরিমাণে আসে; কিন্তু যতটুকু ক'রে আসে পাকা ভাবেই আসে। বৈপ্লবিক গতিতেও আমরা অনেক সময়ে একত্র হই বটে; কিন্তু তার দ্বারা আমরা আবদ্ধ যতটা হই, সব সময়ে মিলিত হই নে ততটা। বিপ্লব অনেকটা বন্যার জলের মতো। সে যখন আসে, ত্বরিত গতিতে দুকূল ভাসিয়ে এসে একেবারে জলস্থল নদীনালা একাকার ক'রে দেয়; কিন্তু চ'লে যখন যায়, প্রায় সব জলটাই সঙ্গে নিয়ে যায়—খালে-বিলে তড়াগে-দীঘিতে যেটুকু ফেলে যায়, তা নিতান্তই সামান্য।

একটা প্রাচীন সংস্কৃত শ্লোক আছে, তার অর্থ হচ্ছে, কবিতা এবং বনিতা যখন স্বয়মাগতা হয় তখনই তা হয় স্বাগতা, অর্থাৎ শুভাগতা। শ্লোকটির মধ্যে যে সত্য আছে, মিলনের ক্ষেত্রেও তা প্রযোজ্য। মিলন যখন টানা-হেঁচড়ার তড়িঘড়ির পথে না এসে স্বেচ্ছায় শান্তগতিতে আসে, তখনই তা যথার্থ আসে, এবং তখনই তা হৃদয়ের রিক্ততা শূন্যতা পূর্ণ ক'রে যথার্থভাবে অবস্থান করে,—বন্যার জলের মতো অকস্মাৎ একদিন স'রে পড়ে না। শুধু ব্যষ্টির মধ্যেই নয়, সমষ্টির মধ্যেও এ কথা সত্য। তার পরিচয় আমি 'বিচিত্রা'-পরিচালনাকালে বহুরূপে বহুবার পেয়েছিলাম। একটি দৃষ্টান্তের দ্বারা সে কথার সাক্ষ্য দেওয়া যেতে পারে।

'অভিজ্ঞান' নামে আমার একটি ধারাবাহিক উপন্যাস কিছুকাল ধ'রে 'বিচিত্রা'য় প্রকাশিত হয়। এই উপন্যাসে পাঁচ-ছয়টি মুসলমান স্ত্রী ও পুরুষ চরিত্র ছিল, তন্মধ্যে মহবুব নামে একটি দুর্বৃত্তের চরিত্রও ছিল। কোনো বিশেষ উদ্দেশ্যের অথবা সদুদ্দেশ্যের দ্বারা প্রণোদিত হয়ে আমি 'অভিজ্ঞানে'র মধ্যে এ চরিত্রগুলির অবতারণা করি নি; একমাত্র কাহিনী গঠনের জন্যই তাদের সহায়তা গ্রহণ করেছিলাম; আর সে কাহিনী-গঠনের একমাত্র উদ্দেশ্য ছিল সাহিত্য সৃষ্টি করা। তৎসত্ত্বেও অযাচিতভাবে নিঃশব্দপদসঞ্চারে বাংলা দেশের মুসলিম সম্প্রদায়ের নিকট হতে যে

অকপট এবং উন্মুক্ত অভিনন্দন আমার কাছে উপস্থিত হয়েছিল, তা আমাকে গভীরভাবে অভিভূত করেছিল।

বহু মুসলমান পাঠক, এমন কি দুই-এক জন মুসলমান পাঠিকাও, আমার অফিসে ও গৃহে আগমন ক'রে 'অভিজ্ঞান' সম্বন্ধে আমাকে তাঁদের অকুণ্ঠিত প্রশংসা এবং অনুমোদন জ্ঞাপন ক'রে যেতেন। 'বিচিত্রা'য় 'অভিজ্ঞান' শেষ হওয়ার পর রাজসাহী-নওগাঁর মুসলিম সম্প্রদায় নওগাঁয় আমন্ত্রিত ক'রে নিয়ে গিয়ে 'অভিজ্ঞান' রচিত করার জন্য আমাকে সংবর্ধিত করেছিলেন। পুলিস-কোর্টের অন্যতম প্রেসিডেন্সি ম্যাজিস্ট্রেট সুসাহিত্যিক এস. ওয়াজেদ আলি সাহেবের কলিকাতা ঝাউতলা রোডের গৃহেও কয়েকজন বিশিষ্ট মুসলিম ভদ্রলোক মিলিত হয়ে 'অভিজ্ঞান' রচিত করবার জন্য আমাকে অভিনন্দিত করেন।

কিন্তু ১৩৩৪ সালের ২২শে আশ্বিন তারিখের 'প্রজাশক্তি' নামক সাপ্তাহিক পত্রে প্রকাশিত "হিন্দু লেখনীতে মুস্লিম নায়ক-নায়িকা" শীর্ষক প্রবন্ধে 'অভিজ্ঞান' সম্বন্ধে কয়েকটি মন্তব্য পাঠের পর এই কথা উপলব্ধি ক'রে আমার বিস্ময়ের অন্ত ছিল না যে, সামান্য একটু সহানুভূতির দ্বারা অপরের হৃদয় জয় করা কত সহজ কারবার, অথচ কত সামান্য ভুলভ্রান্তি-অজ্ঞানতা-অবোঝাবুঝির ফলে এই কারবারে আমরা কত সময়ে কত সহজে দেউলে হয়ে যাই। 'প্রজাশক্তি' পত্রের পরিচালক ছিলেন মৌলভী আবদুল জব্বার পাহলোয়ান এম. এল. এ সাহেব; সম্পাদক ছিলেন সৈয়দ শরিফুল ইসলাম; এবং উল্লিখিত প্রবন্ধের লেখক ছিলেন কাজী নওয়াজ খোদা। কত সহজে, কত সামান্য কারণে বিগলিত হয়ে মানুষের হৃদয় মানুষের হৃদয়ের কাছে এগিয়ে আসে, উল্লিখিত প্রবন্ধের নিম্নোদ্ধৃত মন্তব্যগুলি হতে তা সুস্পষ্ট হবে।—

" ... বিচিত্রা সম্পাদক শ্রদ্ধেয় উপেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায় মহাশয়ের

'অভিজ্ঞান' আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করিল। এই উপন্যাসটি লিখিয়া উদারহৃদয় উপেনবাবু মুস্লিম জনসাধারণের যে উপকার সাধন করিয়াছেন তাহা বর্ণনাতীত। এই উপন্যাসটি মুস্লিম সমাজে Renaissance-এর সৃষ্টি করিয়াছে বলিলেও অত্যুক্তি হয় না।

... সীতা-সাবিত্রীর ন্যায় রমণী যে মুস্লিম ঘরেও জন্মগ্রহণ করিতে পারে 'আমিনাই' তাহার প্রকৃষ্ট প্রমাণ।

... ইসলামিয়া কলেজের ছাত্র নাসির, অর্থাৎ আমিনার দেবর, সন্ধ্যাকে যখন ভগিনী সম্বোধন করিল, তখন মনে হইল, মানুষ যে-কোনো ধর্মাবলম্বী হউক না কেন, স্নেহ ও প্রীতিই তাহাদের প্রধান ধর্ম ও অন্তরের সামগ্রী।

... উপেনবাবু অসাধ্য-সাধন করিয়াছেন। বাংলা সাহিত্যের চিরলাঞ্ছিত ও চিরানুগৃহীত মোস্লেম চরিত্রগুলি তাঁহার হস্তের সোনার কাঠির স্পর্শে যেন উজ্জ্বল ও সজীব হইয়া উঠিয়াছে।"

কিন্তু একান্তই যদি তেমন কিছু হয়ে থাকে তো অন্তরের সহজ-নিষিক্ত সহানুভূতির সিঞ্চন লাভ ক'রেই তা হয়েছে,—যত্নকৃত চেষ্টা-চরিত্রের ফলে হয় নি। এত সহজে যদি 'অসাধ্য সাধন' করা যায়, তা হ'লে কেন এত দ্বন্দ্ব, কেন এত অপ্রীতি, কেনই বা এত সংশয়, সেই কথাই ভাবি। পূর্বে বলেছি, 'অভিজ্ঞানে'র মুসলিম চরিত্রগুলির মধ্যে মহবুব নামে একজন দুর্বৃত্তের চরিত্রও আছে। কিন্তু তার জন্য কোনও ক্ষতি হয় নি। মন যখন সংশয়মুক্ত হয়, চোখে তখন রঙিন কাচের চশমা পড়ে না; প্রত্যেক জিনিসই তখন দেখা দেয় শুভ্র আলোকের অনাবিল কিরণে তাদের আপন আপন নিজস্ব বর্ণে। সংশয়মুক্ত সমালোচক মহবুবকেও তাই দেখতে সক্ষম হয়েছিলেন সহজ চোখের সাদা আলোকে।

"...মানব চরিত্রে দোষ ও চন্দ্রে কলঙ্ক অবশ্যম্ভাবী। সম্পূর্ণ নির্দোষ মানব কোনো সমাজেই নাই। সুতরাং মুস্লিম সমাজেই বা তাহার ব্যতিক্রম হইতে যাইবে কেন? সেই জন্য অভিজ্ঞানে উপেনবাবু মহবুবের ন্যায় এক পাষণ্ডের চরিত্রও অঙ্কন করিয়াছেন। ইহা হইতে স্পষ্টই প্রতীয়মান হয় যে, শ্রদ্ধেয় লেখক নিরপেক্ষভাবে সত্যকার মুস্লিম চরিত্রই লিপিবদ্ধ করিয়াছেন।"

এ থেকে এ কথাও স্পষ্টই প্রতীয়মান হয় যে, শ্রদ্ধেয় সমালোচক নিরপেক্ষভাবে সত্যকার সমালোচনাই লিপিবদ্ধ করিয়াছেন। এ কার্য কিন্তু সহজ কাজ নয়। বুদ্ধি যখন সংস্কারমুক্ত আর বিবেক যখন সত্যনিষ্ঠ থাকে, তখনই এমন কার্য করা চলে।

প্রবন্ধের শেষ কথাটুকুও উদ্ধৃত করলাম।

"...পরম শ্রদ্ধাস্পদ উপেনবাবু মুস্লিম সমাজের অন্তরের নীরব কৃতজ্ঞতা গ্রহণ করুন। বাংলার দীন মুস্লিমেরা তাঁহাকে প্রাণের ভক্তিসিংহাসনে স্থান দিয়াই ক্ষান্ত হইবে, কারণ তাহার অধিক তাহাদের সাধ্যাতীত।"

অনেক ইতস্তত সহকারে যৎপরোনাস্তি কুণ্ঠা ও সঙ্কোচের সহিত উল্লিখিত মন্তব্যগুলি, বিশেষত শেষ মন্তব্যটি, উদ্ধৃত করলাম। কেবলই মনের মধ্যে সংশয় পীড়া দিচ্ছিল, এর দ্বারা নিজেকে প্রচার করা হবে না তো?

জীবনে আত্মপ্রচার কখনো করি নি—যদি বলি, তা হ'লে বোধ করি আর-এক আকারে সেই আত্মপ্রচার করা হয়। তবে এ কথা যদি বলি—সে কার্য খুব বেশি করি নি, আর যখনই মনে হয়েছে করছি, তখনই নিজেকে সম্বৃত করবার চেষ্টা করেছি, তা হ'লে বোধ হয় তেমন কিছু অপ্রকৃত কথা বলাও হয় না। যে কথা উপস্থিত আমার প্রতিপাদ্য—

অর্থাৎ নিজের মনকে সামান্য একটু উন্মুক্ত করলে পরের মনে প্রবেশের পথ অতি সহজে উন্মুক্ত হয়—সেই প্রতিপাদ্য বস্তুর প্রমাণে সাক্ষ্য দিতে গিয়ে যেটুকু অবিনয় করতে হ'ল তার জন্য ক্ষমা ভিক্ষা করছি। আদালতে শপথ গ্রহণ কালে শুধু 'যা-কিছু বলব সত্য বলব, মিথ্যা বলব না' বললেই পরিত্রাণ পাওয়া যায় না;—'কোনো কথা গোপন করব না'ও বলতে হয়। আমি তাই এ কথাগুলি গোপন না ক'রে প্রকাশ করলাম। আশা করি, আমার জবানবন্দির দ্বারা আমার প্রতিপাদ্য সত্য প্রতিপন্ন করতে কতকটা সক্ষম হয়েছি।

কোনো মিলন-সাধন, এমন কি হিন্দু-মুসলমান মিলন-সাধনও, অসাধ্য ব্যাপার নয়। শুধু তার জন্য চাই সামান্য একটু ভালবাসা আর অল্প একটু সহানুভূতি।

'বিচিত্রা'-পরিচালনার জন্য আমি পাকাপাকিভাবে ভাগলপুর ত্যাগ করলাম ১৩৩৪ সালের ফাল্গুন মাসে। কলিকাতায় আগমন করলাম কিন্তু সমূলে উৎপাটিত হয়ে নয়। মূল, অর্থাৎ আমি বাদে বাকি সংসার, আপাতত ভাগলপুরেই রইল। বারো বৎসর ধ'রে যে মূল গভীরভাবে আত্মবিস্তার করেছিল, সহসা উৎপাটিত হতে তা বেদনা বোধ করলে।

সুবিখ্যাত সাহিত্যিক শ্রীযুক্ত অন্নদাশঙ্কর রায় তখন সিভিল সার্ভিস পরীক্ষা দেবার জন্য বিলাত যাত্রার উদ্যোগে রত। তখনো তিনি সুবিখ্যাত, এমন কি বিখ্যাতও হন নি। ঠিক মনে পড়ছে না, কি প্রকারে তাঁর সাহিত্য-প্রতিভার পরিচয় অথবা সংবাদ পেয়েছিলাম। অন্নদাশঙ্কর কটকে বাস করতেন। আমার ভ্রাতুষ্পুত্রী শ্রীমতী নির্মলাও বাস করতেন কটকে। তাঁর স্বামী, বর্তমানে পাটনা হাইকোর্টের বিচারপতি, শ্রীযুক্ত সুবোধচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় তখন কটকে ওকালতি করেন। নির্মলার দ্বারা অন্নদাশঙ্করের সহিত যোগ স্থাপন ক'রে 'বিচিত্রা'য়

তাঁর লেখা প্রকাশিত করবার ব্যবস্থা করলাম। ১৩৩৪ সালের শ্রাবণ মাসে অন্নদাশঙ্কর বিলাত যাত্রা করলেন; তার তিন মাস পর থেকে, অর্থাৎ কার্তিক মাস থেকে 'বিচিত্রা'য় প্রকাশিত হতে লাগল তাঁর বিখ্যাত রচনা "পথে-প্রবাসে," যা অবিলম্বে তাঁকে সুবিখ্যাত ক'রে তুলেছিল। একটি লেখার দ্বারা অন্নদাশঙ্কর যে বিপুল প্রতিষ্ঠা অর্জন করতে সক্ষম হয়েছিলেন, বাংলা-সাহিত্যের ইতিহাসে তার তুলনা খুব বেশি নেই। 'পথে-প্রবাসে'র মধ্যে অন্নদাশঙ্কর যে উন্নত শ্রেণীর সাহিত্য-প্রতিভার পরিচয় দিয়েছিলেন, আজও তা সতেজে পল্লবিত ও পুষ্পিত হয়ে প্রসার লাভ ক'রে চলেছে।

'পথে-প্রবাসে' 'বিচিত্রা'য় অন্নদাশঙ্করের প্রথম প্রকাশিত রচনা নয়। বিলাত যাত্রার পূর্বে তিনি "রক্তকরবীর তিনজন" নামে একটি প্রবন্ধ দিয়ে গিয়েছিলেন, সেটি 'বিচিত্রা'র ভাদ্র মাসের তৃতীয় সংখ্যায় প্রকাশিত হয়েছিল।

ভাগলপুর ছেড়ে আসবার পূর্বে বিভূতিবাবুর সহিত 'বিচিত্রা' সম্বন্ধে কথাবার্তা পাকা করলাম। বিভূতিবাবু, অর্থাৎ বাংলা দেশের স্বনামধন্য কথাশিল্পী সম্প্রতি-পরলোকগত বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়।

সে সময়ে বিভূতিবাবু চাকরি উপলক্ষে ভাগলপুরে বাস করছেন। কলিকাতা পাথুরিয়াঘাটার বিখ্যাত ঘোষ বংশের খেলাতচন্দ্র ঘোষ এস্টেটের তিনি ছিলেন নায়েব-তহসিলদার (সারকল্ অফিসার)। প্রধানত তিনি ভাগলপুরেই থাকতেন; মাঝে মাঝে ভাগীরথীর উত্তর পারে অবস্থিত দিয়া-ইসলামপুর নামক জঙ্গল-মহল পরিদর্শন করতে যেতেন।

ভাগলপুর শহরে ও আশপাশে বিভূতিভূষণের মনের খোরাকের অভাব ছিল না। নগরের শেষ প্রান্ত লেহন ক'রে সুবিস্তীর্ণ ভাগীরথী নদী প্রবাহিত; তার অপর পারে দিগন্তবিস্তৃত বালুচরের মায়া; দিকে দিকে ঘননিবদ্ধ তালবৃক্ষের কুঞ্জ; চতুর্দিকে উচ্চ পাড় দিয়ে ঘেরা দীর্ঘায়ত জলাশয় শাজঙ্গি ও তার সন্নিহিত আরণ্য শোভা; নগরের পশ্চিম প্রান্ত হতে কিছু দূরে মহাবীর কর্ণের রাজধানী চম্পানগর তার সুপ্রাচীন ঐতিহ্যের মহিমা সহ বর্তমান; চম্পানগরের বাঙালী জমিদার স্বনামখ্যাত মহাশয় তারকনাথ ঘোষের পল্লী হতে মাইল আষ্টেক দূরবর্তী পূর্বপ্রান্তে অবস্থিত সুপ্রসিদ্ধ বিহারী জমিদার শ্রীমোহন ঠাকুর, উগ্রমোহন ঠাকুর, প্রাণমোহন ঠাকুর প্রভৃতির বিশাল অট্টালিকাসমূহ-সমাকীর্ণ বারারি পল্লী পর্যন্ত বিস্তৃত রাজপথ; তার উভয় পার্শ্বে পক্ষিকলকূজিত বিচিত্র বিটপীশ্রেণী। এ সকল বস্তু বিভূতিভূষণকে আকৃষ্ট করত এবং প্রেরণা

জোগাত নিশ্চয়ই ; কিন্তু দু-চার দিন ইসলামপুরে যাপনের পর তিনি ভাগলপুরে ফিরতেন নিবিড়তর আনন্দ ও গভীরতর আবেশভরা মন নিয়ে। ভাগলপুরে ফিরে আসার পর কয়েক দিন ধ'রে ইসলামপুরের অরণ্য এবং বালুকাভূমি খচিত যে স্বপ্ন তিনি দেখতেন, আমাদের মনের মধ্যেও তা সঞ্চারিত না ক'রে ছাড়তেন না।

একদিনের সুমিষ্ট স্মৃতি এত দীর্ঘকাল পরেও সুস্পষ্ট হয়ে মনের মধ্যে বিরাজ করছে। সকালবেলা বৈঠকখানায় একা ব'সে কাজ করছি, এমন সময়ে একটি অপরিচিত যুবক ঘরে প্রবেশ করলেন। দেহের রঙ ঈষৎ শ্যামল, মুখে মৃদু সলজ্জ হাসি, চোখ দুটি উৎসুক-উজ্জ্বল, আর সমস্ত মুখাবয়ব জুড়ে অনাবিল সরলতার সুস্পষ্ট পরিচয়। স্নিগ্ধ অমায়িক আকৃতি দেখে মন খুশি হ'ল। বয়স মনে হ'ল ত্রিশ-বত্রিশ বৎসর।

নিকটে উপস্থিত হয়ে স্মিতমুখে যুবক জিজ্ঞাসা করলেন, "আপনিই কি উপেনবাবু?"

একটা চেয়ার দেখিয়ে বললাম, "বসুন। হ্যাঁ, আমি উপেন। আপনার পরিচয়?"

চেয়ারে উপবেশন ক'রে যুবক বললেন, "আমার নাম বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়। আপনি ভাগলপুরে থাকেন তা জানি। অনেক দিন থেকে আপনার সঙ্গে আলাপ করবার ইচ্ছে, কিন্তু বাড়ি চিনতাম না ব'লে এতদিন আসতে পারি নি।"

একে বাঙালী, তার ওপর বগলে কাগজপত্রের বাণ্ডিলের প্রতীক নেই,—সুতরাং এ কথা বুঝতে বিলম্ব হ'ল না, আমি যে পুষ্করিণীতে কারবার করি, সে পুকুরের মাছ নয়,—অর্থাৎ মক্কেল নয়। জিজ্ঞাসা করলাম, "ভাগলপুরে থাকেন?"

বিভূতিবাবু বললেন, "আপাতত ভাগলপুরেই আছি, কিন্তু আমি এখানকার লোক নই।"

তবে কোথাকার লোক? বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায় নামে আমার কোনও আত্মীয়-স্বজন আছেন ব'লে মনে পড়ল না। তা হ'লে আমার সঙ্গে আলাপ করতে ইচ্ছা হবার সূত্রটা কোথায়? সাহিত্য? হতেও পারে। ভাগলপুরে বেড়াতে এসে ইতিপূর্বে কেউ কেউ সাহিত্যের সূত্র ধ'রে আমার সঙ্গে আলাপ ক'রে গেছেন। কলিকাতা প্রেসিডেন্সি কলেজের ইংরেজী সাহিত্যের সুবিখ্যাত অধ্যাপক তীক্ষ্ণসাহিত্যবোধসম্পন্ন সাহিত্যরসিক শ্রীযুক্ত সোমনাথ মৈত্র 'শশিনাথ' নামে আমার উপন্যাস পাঠের পর ভাগলপুরে বেড়াতে এসে আমার সঙ্গে সাক্ষাৎ ক'রে আলাপ করেছিলেন। ইনিও যদি সেইভাবেই এসে থাকেন তো বিস্মিত হবার তেমন কিছু থাকে না। কিন্তু খোলাখুলিভাবে সে কথা জিজ্ঞাসা করাও তো যায় না। বললাম, "আমার বাড়ি চিনতেন না, সে কথা বুঝলাম; কিন্তু আমাকে চিনতেন কি সূত্রে?"

উত্তরে বিভূতিবাবু যে কথা বললেন, তাতে বুঝলাম আমার অনুমানে ভুল হয় নি; বললাম, "আপনিও তা হ'লে একজন সাহিত্যিক?"

বিভূতিবাবু বললেন, "সাহিত্যিক কি-না বলতে পারি নে, কিন্তু সাহিত্যকে ভালবাসি, আর তার প্রমাণ দিয়েছি আপনাকে খুঁজে বার ক'রে।" ব'লে হাসতে লাগলেন।

দেখতে দেখতে আড্ডা উঠল জ'মে। প্রথম পরিচয়কালের শিষ্টাচার-প্রসূত সতর্ক কথোপকথন অবিলম্বে অন্তর্হিত হ'ল; খোলা মনের আলগা-হালকা কথায় কথায় একটা নিবিড় সৌহৃদ্য সেই বৈঠকেই সৃষ্টিলাভ করলে। সেই দিনই অপরাহ্ণে বিভূতিবাবুকে আমার গৃহে চা-পানের নিমন্ত্রণ করলাম; এবং চা-পানের পর তাঁকে নিয়ে

উপস্থিত হলাম অমরেন্দ্রনাথের গৃহে আমাদের দৈনন্দিন সান্ধ্য মিলন-সভায়।

তার পর থেকে প্রতিদিন অপরাহ্ণে মাইলখানেক দূরবর্তী যোগশর পল্লীর 'বড়বাসা' থেকে বিভূতিভূষণ আমাদের দলে আড্ডা দেবার আগ্রহে আদমপুরে আমার গৃহে এসে উপস্থিত হতেন; তৎপরে আমরা উভয়ে একত্র হয়ে অমরেন্দ্রনাথের গৃহের বহিঃপ্রাঙ্গণে ভাগীরথী-তীরবর্তী শ্যামশষ্পের হরিৎ আস্তরণের উপর আশ্রয় নিতাম। আমাদের মাথার উপরে থাকত নীল আকাশের বিস্তৃতি; চোখের সম্মুখে সুদূর প্রান্তে আকাশ এবং ধরিত্রীর মিলন-রেখা।

'পথের পাঁচালী' উপন্যাসের পরিকল্পনা ও সূচনা বিভূতিভূষণ কবে ও কোথায় করেছিলেন, তা আমার ঠিক জানা নেই। পরে জানতে পেরেছি, পরিকল্পনা যেখানেই করুন, সূচনা তিনি ভাগলপুরেই করে-ছিলেন। তবে এ কথা আমার জানা আছে, কলিকাতায় লিখিত শেষের দিকের সামান্য অংশ ব্যতীত বাকি সবটাই তিনি ভাগলপুরে থাকতে লিখেছিলেন। মাঝে মাঝে আমাকে বড়বাসায় নিয়ে গিয়ে 'পথের পাঁচালী'র পাণ্ডুলিপি পাঠ ক'রে শোনাতেন; কখনো কখনো আমার আদমপুরের বাড়িতে পাণ্ডুলিপি নিয়ে এসেও পড়তেন। মুগ্ধ হয়ে আমি শুনতাম এবং পাঠ শেষ হ'লে প্রচুরভাবে প্রশংসা করতাম। আমার উচ্ছল অবারিত প্রশংসায় বিভূতিবাবুর মনে প্রতীতির আনন্দ দেখা দিত। উৎসাহের সহিত তিনি রচনার কার্যে ব্যাপৃত হতেন।

একটা মাসিকপত্র বার করবার পরিকল্পনা করছি—সে কথা বিভূতি-বাবুকে অনেক দিন থেকেই জানিয়ে আসছিলাম। কিন্তু এমনই অলস আগ্রহের সহিত সে কথা বলতাম যে, তিনি তার উপর খুব বেশি গুরুত্ব আরোপ করতেন না। বোধ হয় মনে করতেন, ওটা আমার নিতান্তই

বিনা মাশুলের ইচ্ছাবিলাস। ছাত্রজীবনে যে ব্যাপারে একাধিকবার শখ মিটিয়েছি, তারই একটা জমকালো রূপের স্বপ্ন দেখা।

বিভূতিবাবু সর্বদাই আমাদের পল্লীতে বেড়াতে আসতেন, মাঝে মাঝে আমিও তাঁর বাসায় যেতাম। একদিন তেমনি গেছি, কথাবার্তার মধ্যে এক সময়ে বিভূতিবাবু জানালেন, 'প্রবাসী'র কর্তৃপক্ষ তাঁর 'পথের পাঁচালী' ফেরত দিয়েছেন।

বিস্মিত হলাম; কিন্তু মনের একটা গোপন প্রদেশ খুশি হয়েও উঠল। বললাম, "যে জিনিস আমার অদৃষ্টে স্থির হয়ে আছে, তা ফেরত না এসে উপায় কি? বেশ মন লাগিয়ে লিখে ফেলুন, শেষ হ'লেই 'বিচিত্রা'য় বার করব।"

হাসিমুখে বিভূতিবাবু বললেন, "অনেক দিন থেকে তো শুনছি, কিন্তু আপনার কাগজ কি সত্যি সত্যিই বেরোবে?"

বললাম, "বেরোবে না কি রকম? রবীন্দ্রনাথের কাছে প্রতিশ্রুতি লাভ করলাম, শরৎচন্দ্রের সঙ্গে ঝগড়া ক'রে এলাম সে-সব কি বৃথা যাবে? তা ছাড়া, যে আগুন একদিন ভাল ক'রে জ্বলবে, তা অনেক দিন থেকেই ধোঁয়া ছাড়ে।"

তেমনি হাসিমুখে বিভূতিবাবু বললেন, "জ্বললেই খুশি হব। কিন্তু বিশ্বাস কেন হয় না, জানেন?"

হাসিমুখে বললাম, "কেন?"

"আপনার দুঃসাহসের কথা মনে ক'রে। সংসার তো আপনার নিতান্ত ছোট নয়,—আর সে সংসার চালাবার ব্যবস্থাও এখানে অনেক দিন থেকে কায়েম রয়েছে। সে সব ছেড়ে-ছুড়ে একেবারে অন্য পথে যাওয়ার কথা সহজে বিশ্বাস হয় কি?"

বললাম, "পুরুষের ভাগ্য যখন দেবতাদেরও অজ্ঞেয়, তখন অবিশ্বাস

করবারই বা কি আছে? বারো বৎসর আগে একদিন কলকাতা থেকে শেকড় উপড়ে ভাগলপুরে এসেছিলাম, আজ আবার ভাগলপুর থেকে শেকড় উপড়ে কলকাতায় চলেছি। হয়তো যে মাটির গাছ, সেই মাটিতেই ফিরে যাচ্ছি। ভবিষ্যতে সে গাছে ফল ধরবে অথবা গাছ শুকিয়ে মরবে, সেটা পুরুষস্য ভাগ্যং।”

মাথা নেড়ে বিভূতিবাবু বললেন, “না না, সে গাছ শুকিয়ে মরবে না, তাতে ফলই ধরবে।”

‘বিচিত্রা’য় ‘পথের পাঁচালী’ প্রকাশিত হবার প্রস্তাবে বিভূতিবাবু অতিশয় খুশি হয়ে উপন্যাস শেষ করতে এবং লিখিত অংশ পরিবর্তিত এবং পরিমার্জিত করতে প্রবৃত্ত হলেন। আষাঢ়, ১৩৩৫ অর্থাৎ দ্বিতীয় বর্ষের প্রথম সংখ্যা হতে ‘বিচিত্রা’য় মাসে মাসে ধারাবাহিকভাবে ‘পথের পাঁচালী’। প্রকাশিত হতে আরম্ভ করে। তৎপূর্বে “বউচণ্ডীর মাঠ” ও “নব বৃন্দাবন” নামে তাঁর দুইটি গল্প প্রকাশিত হয়েছিল।

## ১১

কলিকাতায় এসে লেখা এবং চিত্র সংগ্রহের কার্যে আত্মনিয়োগ করলাম। গল্প উপন্যাস এবং সাধারণ প্রবন্ধ সংগ্রহ করা তত কঠিন কাজ নয়। সচিত্র প্রবন্ধ প্রকাশ করবার পক্ষে সর্বাপেক্ষা কঠিন কাজ— সেই সকল প্রবন্ধ সংগ্রহ করা অথবা ফরমায়েশ দিয়ে লেখানো, যেগুলিকে চিত্রিত করা চলবে। উপাদেয় প্রবন্ধের সঙ্গে উৎকৃষ্ট চিত্রের মণি-কাঞ্চনের যোগসাধন বাংলা দেশে, অসাধ্য যদিই বা না হয়, দুঃসাধ্য ব্যাপার তদ্বিষয়ে সন্দেহ নেই।

সংবাদপত্রের সাধারণ বিজ্ঞাপনের ফলে এবং ব্যক্তিগত চেষ্টা-চরিত্রের সাহায্যে লেখা জ'মে উঠতে লাগল আশাতীত পরিমাণে। এ কথা কৃতজ্ঞচিত্তে স্বীকার করি, অত বৃহৎ এবং ব্যয়সাধ্য কাগজ পরিচালনার কঠিন কার্য নির্বাহ করতে পারা গিয়েছিল বহুল পরিমাণে বাংলা দেশের সহৃদয় লেখক এবং চিত্রশিল্পীদের উদার সহানুভূতি এবং অকুণ্ঠ সহযোগিতার কল্যাণে। যে বৃক্ষেরই তলায় গিয়ে হাত পেতেছি, নিষ্ফল হই নি; ফল হাতে ক'রে ফিরেছি। অবশ্য শরৎ-বৃক্ষ প্রথমটা প্রবলভাবে মাথা দুলিয়ে 'না' বলেছিল বটে; কিন্তু শেষ পর্যন্ত একদিন সে বৃক্ষ নিজের ভুল বুঝতে পেরে স্বতঃপ্রবৃত্ত হয়ে এসে বোঁটা আলগা করেছিল।

অচিরকালের মধ্যে অবস্থা এমন দাঁড়াল যে, প্রবন্ধ গল্প উপন্যাসের কলেবর দেখে চিন্তিত হলাম; আর কবিতার সংখ্যা দেখে হলাম দুশ্চিন্তিত। টাকা-আনা-পয়সার ক্ষেত্রে ব্যয়ের চেয়ে আয় বেশি হওয়া যে উল্লাসকর বস্তু, প্রবন্ধ গল্প-উপন্যাসের ক্ষেত্রে সব সময়ে তা নয়।

টাকা-আনার ব্যাপারে ব্যয় অপেক্ষা আয় অধিক হ'লে তাগাদার পরিমাণ হ্রাস পায়; প্রবন্ধ-গল্পের ব্যাপারে বাড়ে। এ পথের আমার অগ্রজ-মহাজন 'ভারতবর্ষ'-সম্পাদক জলধর সেন মহাশয়ের এ বিষয়ে অবস্থা অবগত হয়ে এবং যে উপায়ে তিনি সেই অবস্থা সামলে চলছেন, তা জানতে পেরে যুগপৎ আশ্বস্ত এবং পুলকিত হলাম।

মাত্র তিন-চারদিন হ'ল বাংলা দেশে 'বিচিত্রা' প্রথম আত্মপ্রকাশ করেছে। সময় তখন অপরাহ্ণ চার ঘটিকা। সবেমাত্র কাগজ বেরিয়ে যাওয়ায় কাজের চাপ কিছু কম। পটলডাঙা স্ট্রীটের 'বিচিত্রা'-আপিসে আমার ঘরে ব'সে অলস নিশ্চিন্ততায় এ-কাজ ও-কাজ সে-কাজ দেখছি ;—যতিনাথ এলে চা-পান ক'রে দুজনে পথে বেরিয়ে পড়া যাবে।

যতিনাথ থাকতেন শ্যামবাজারে, আমি বাগবাজারে। হাইকোর্ট থেকে গৃহে পৌঁছে বেশ পরিবর্তন ক'রে চা-খাবার খেয়ে যতিনাথ বেরিয়ে পড়তেন পটলডাঙা স্ট্রীটের 'বিচিত্রা'-কার্যালয়ের উদ্দেশ্যে। সাড়ে পাঁচটা-ছটার মধ্যে এসে পৌঁছতেন; হাতের কাজ সেরে, আর এক দফা চা-পান ক'রে দুজনে পথে বেরিয়ে পড়তাম। যানবাহনের আমরা তোয়াক্কা রাখতাম না, রাজপথের জনাকীর্ণ ফুটপাথ ধ'রে পরম সন্তুষ্টচিত্তে গল্পে মশগুল হয়ে দুজনে পদচালিত করতাম কলকাতার উত্তরপ্রান্ত অভিমুখে। পার্শ্ববর্তী গতিচঞ্চল পথের কর্কশ নিনাদ পরস্পরের প্রতি গভীর আগ্রহে নিয়োজিত আমাদের উভয়ের কর্ণপ্রান্তে এসে স্তব্ধ হয়ে যেত; আমাদের মৃদু আলাপনে বিঘ্ন ঘটাত না। দেখতে দেখতে দীর্ঘ পথ শেষ হয়ে যেত, কথা কিন্তু তখনো শেষ হ'ত না। যতিনাথ বাঁয়ে ভাঙতেন, আমি তখনো এগিয়ে চলতাম সোজা উত্তর দিকে।

আপিস থেকে অন্য কোথাও যাবার প্রয়োজন না থাকলে, বিশেষত যতিনাথ এসে উপস্থিত হ'লে নিয়মিত পদব্রজেই গৃহে ফিরতাম। আমি

হাঁটতাম এক ফের,—যতদূর মনে পড়ে, যতিনাথ কিন্তু হাঁটতেন উভয় ফের। গৃহ থেকে 'বিচিত্রা'-কার্যালয়ে তিনি আসতেনও পদব্রজেই। যে কথা বলতে আরম্ভ করেছিলাম, তা শেষ করি।

হাল্‌কা নিশ্চিন্ত মনে দুই-একটা লেখা টেখা পড়ছি, এমন সময়ে হয়তো নিতান্তই মোটা বর্মা চুরুট মুখে কক্ষে প্রবেশ করলেন জলধর সেন।

তাড়াতাড়ি দাঁড়িয়ে উঠে ব্যগ্রকণ্ঠে বললাম, "আসুন দাদা, আসুন, আসুন। কি ভাগ্যি, দয়া ক'রে এসে পড়েছেন! 'বিচিত্রা' পেয়েছেন?"

চেয়ারে উপবেশন ক'রে মুখ থেকে চুরুটটা খুলে নিয়ে জলধরবাবু বললেন, "পেয়েছি। 'ভারতবর্ষে'র কপি পেয়েছি, আমার নিজস্ব কপিও পেয়েছি। পেয়েই তো ব্যস্ত হয়ে আসছি। কি কাণ্ড করেছ বল তো?"

ঈষৎ উদ্বিগ্ন হয়ে বললাম, "কেন বলুন দেখি?"

"আরে, ও কি একটা মাসিকপত্র হয়েছে? ও তো হয়েছে উপহারের বই।"

"আপনার ভাল লাগে নি?"

"ভাল লাগবে না কেন? অত গুড় ঢেলেছ, মিষ্টি লাগবে না? কিন্তু যে চালে আরম্ভ করলে, সে চাল শেষ পর্যন্ত রাখতে পারবে কি?"

সহাস্যমুখে বললাম, "পারব কি না সে তো ভবিষ্যতের কথা, এখন কি ক'রে বলব? তবে চেষ্টা তো করব রাখতে।"

"প্রতি কপি কত ক'রে পড়তা পড়েছে খতিয়ে দেখেছ?"

বললাম, "মোটামুটি দেখেছি। চোদ্দ আনা ক'রে।"

জলধর সেন বললেন, "দু আনা লুকোচ্ছ। আমার তো মনে হয়, পুরোপুরি এক টাকা ক'রেই পড়ছে। আচ্ছা, চোদ্দ আনাই যদি হয়, বেচছ আট আনা ক'রে। তা হ'লে কি ক'রে চলে বল?"

বললাম, "চোদ্দ আনাকে ক্রমশ চার আনায় নামিয়ে আনতে হবে।"

"লোকে কিনবে কেন? আট আনা দিয়ে যারা একদিন চোদ্দ আনার মাল কিনেছে, আট আনা দিয়ে তারা চার আনার মাল কেন কিনবে বল?"

হাসিমুখে বললাম, "কিনবে দাদা, ভালবাসা জ'মে গেলে কিনবে। ফুলশয্যের রাত্রে নতুন বউকে পরাতে হয় দামী রেশমী কাপড়, খাওয়াতে হয় উৎকৃষ্ট খাবার, শোয়াতে হয় মূল্যবান শয্যায়, তার গলায় দিতে হয় ফুলের মালা। কিছুদিন বাদে সে হয়তো পরে মিলের মোটা শাড়ি, খায় শাক দিয়ে মোটা চালের ভাত, শোয় ময়লা ছেঁড়া বিছানায়। অথচ তখনো চলে; হয়তো ফুলশয্যার রাত্রির চেয়েও ভাল ভাবেই চলে, কারণ তখন ভালবাসা জ'মে গেছে।"

জলধর সেন বললেন, "তোমার পাঠকদের ভালোবাসা জমুক, তাই কামনা করি। ভাগলপুরে ওকালতি করতে, অবসর সময়ে সাহিত্য সৃষ্টি করতে—সে বেশ ছিল। সাহিত্যের কারবারী হওয়ার চেয়ে সাহিত্যিক হওয়া অনেক ভাল।"

আমি জানতাম, জলধর দাদার আসল ক্ষোভের বাসা কোথায়। কিছুকাল যাবৎ আমি ছিলাম একমাত্র 'ভারতবর্ষে'র লেখক। আমার লিখিত উপন্যাস একটির পর একটি একমাত্র 'ভারতবর্ষে'ই প্রকাশিত হয়ে চলেছিল; আর কোথাও হ'ত না। সুতরাং আমার দ্বারা দাদা ছিলেন তাঁর 'ভারতবর্ষে'র খানিকটা অংশের বিষয়ে এক রকম নিশ্চিন্ত। এমন সময়ে, যতদূর মনে পড়ে, ১৩৩১ সালের বৈশাখ মাসে 'প্রবাসী'তে আমার ধারাবাহিক উপন্যাস 'রাজপথ' দেখা দিলে। এ ঘটনায় জলধরবাবু প্রসন্ন হন নি, তার প্রমাণ পেয়েছিলাম। যাই হোক, তবু সে অবস্থায় ভাগাভাগির পথ ছিল। কিন্তু লেখক থেকে হঠাৎ ডবল প্রমোশন পেয়ে সম্পাদক হওয়ায়, যে ছিল এতদিন জোগানদার সে একেবারে হয়ে

দাঁড়াল ভাগীদার। এখন থেকে জোগান দেওয়া সে তো বন্ধই করলে, উপরন্তু হয়তো বা ভাগ বসাতে আরম্ভ করবে। এইরূপ অবস্থায় দাদা যদি মোটের উপর সন্তুষ্ট হতে না পারেন, তাঁকে দোষ দেওয়া যায় না।

কথোপকথন মোড় নিয়ে অন্য দিকে বিস্তার লাভ ক'রে চলল। কথায় কথায় এক সময়ে বললাম, "ভারি অসুবিধায় প'ড়ে গেছি দাদা।"

দাদা তখন মুখে চুরুট পুরেছেন। চুরুটজোড়া-মুখ উপর দিকে নেড়ে সাঙ্কেতিক প্রশ্ন করলেন, কি অসুবিধা?

বললাম, "গ্রহণের উপযুক্ত যে সকল লেখা আসছে তা ছাড়তেও পারছি নে, অথচ নির্বাচিত হয়ে যে-লেখা জ'মে গেছে, তা প্রায় মাস দুয়েকের খোরাক।"

মুখ থেকে চুরুট বার ক'রে দাদা বললেন, "দু মাসের মত লেখা জ'মে যাওয়ায় তুমি ঘাবড়ে গেছ ভায়া, আর আমি যদি দু বৎসর কোন লেখা না পাই, কাগজ বার করবার পক্ষে আমার কোনো অসুবিধা হয় না।"

শুনে আমার চক্ষু বিস্ফারিত হয়ে উঠল। সকৌতূহলে ও সবিস্ময়ে বললাম, "বলেন কি দাদা! কি ক'রে লেখকদের থামান?"

প্রশান্ত কণ্ঠে দাদা বললেন, "ঐ ভাই-ভাই ব'লে পিঠে হাত বুলিয়ে।"

সর্বনাশ! দু বৎসরের লেখকদের তাগাদা যদি পিঠে হাত বুলিয়ে ভাই-ভাই ব'লে সামলাতে হয়, তা হ'লে একমাত্র সেই কাজই তো সমস্ত সময় গ্রাস করবার পক্ষে যথেষ্ট। রচনা পরীক্ষণ তো দূরের কথা, বোধ করি, নিশ্চিন্ত হয়ে প্রুফ দেখার কাজও করা চলে না।

কবিতার কথা উঠল।

বললাম, "কবিতার কি করা যায় বলুন তো দাদা? গল্প যদি দুটো আসে তো কবিতা আসে কুড়িটা।"

নির্বিকারভাবে দাদা বললেন, "ঐ একবার চোখ বুলিয়ে, তেমন

বুঝলে লাল পেন্সিল দিয়ে 'আর' (R) লিখে ফাইল ক'রে রাখবে। স্ট্যাম্প থাকলে ফেরত পাঠাবে।"

কবিতা সম্পর্কে জলধরদাদার নামে একটি কৌতুকজনক গল্প প্রচলিত আছে। আহার করতে দাদা ভালবাসেন—এ কথা রাষ্ট্র ছিল। নবীন কবিযশঃপ্রার্থিগণ এই ব্যাপারের সুযোগ গ্রহণ করবার জন্য দাদাকে আহারের নিমন্ত্রণ দিয়ে চর্বচোষ্যলেহ্যপেয় ক'রে খাওয়াতেন। আহারান্তে ক্ষণকাল বিশ্রাম গ্রহণের পর দাদা যখন বিদায় গ্রহণ করতে উদ্যত হতেন, অতি সঙ্কোচে সন্তর্পণে একটি কুণ্ঠিত ভীত কবিতা দাদার হাতে এসে আশ্রয় লাভ করত – "দাদা, যদি পছন্দ হয়, তা হ'লে 'ভারতবর্ষে'—"

দাদা কতকটা প্রস্তুত হয়েই থাকতেন। নির্বিকারভাবে কবিতাটি জামার পকেটে নিক্ষেপ ক'রে শান্তকণ্ঠে বলতেন, "আচ্ছা।" পথে বার হয়ে একটু দূরে গিয়েই দাদা পকেট থেকে কবিতাটি বার ক'রে সরাসরি বিচার করতেন। কচিৎ কখনো কোন কবিতার সৌভাগ্য হ'ত পকেটের বন্দিশালা থেকে কবিতার ফাইলে মুক্তিলাভ ক'রে শেষ পর্যন্ত 'ভারতবর্ষে' প্রকাশিত হবার। এইভাবে সংগৃহীত অ-মনোনীত কবিতার দ্বারা দাদা ফাইলের ভার বৃদ্ধি করতেন না; প্রায় সব কবিতাগুলিই জামার পকেটে থেকে যেত। জামা রজক-ভবনে যাবার সময়ে অতর্কিতে সেগুলিকে বার ক'রে নেওয়া হয়ে উঠত না, কয়েকদিন পরে সেগুলি ফিরে আসত নিষ্পাপ শুভ্রতার রূপ পরিগ্রহ ক'রে। তাদের কুণ্ঠিত কুঞ্চিত অবয়ব উন্মোচিত ক'রে কবিতার নাম থেকে কবির নাম পর্যন্ত কালিমার কোনো রেখাই খুঁজে পাওয়া যেত না।

কবিতার বিষয়ে আমার কিন্তু কিছু দুর্বলতা ছিল। প্রত্যেক কবিতা আমি ভাল ক'রে প'ড়ে দেখতাম এবং এমন অনেক কবিতা 'বিচিত্রা'য় প্রকাশিত করেছিলাম যার রচয়িতার কিছুমাত্র পূর্ব-পরিচয় ছিল না।

কিন্তু তা হ'লে কি হয়? প্রকাশ করবার মতো কবিতা যদি একটি পেতাম, ফেরত পাঠাবার মতো পেতাম একশোটি। সুতরাং মোটের উপর শত্রুতা বৃদ্ধিই হ'ত অনেক বেশি পরিমাণে। প্রত্যেক হতাশ-কবির মনে অনিবার্যভাবে আমি তার শত্রু ব'লে বিবেচিত হতাম। পথে ঘাটে ট্রামে এঁদের সাক্ষাৎ পেলেই চিনতে পারতাম। ট্রামে হয়তো চলেছি, যখনই দেখতাম দূর কোণে ব'সে কোন যুবক রোষপ্রদীপ্ত নেত্রে আমার দিকে তাকিয়ে আছে তখনই বুঝতাম, তার কবিতা ফেরত দিয়েছি আর সে মনে মনে বলছে—ঐ চলেছে সেই পাষণ্ড, যে আমার কবিতা ফেরত দিয়েছে।

পূর্বজন্মের অনেক পাপ থাকলে সম্পাদক হয়ে তার প্রায়শ্চিত্ত করতে হয়। তাই বারো বৎসর পরে 'বিচিত্রা' যখন উঠে গিয়েছিল, মনে মনে নাক-কান ম'লে সঙ্কল্প করেছিলাম, জীবনে আর নয়; এই প্রথম ও এই শেষ।

কিন্তু হায়! তখন কি ভেবেছিলাম, নিয়তি নামে এক পরমা শক্তি আছে, যা আমাদের অনেক সঙ্কল্পকেই চূর্ণ করে। তবে একমাত্র সান্ত্বনা, এবার কাব্যকলালক্ষ্মীর সুকুমার দেহে আঘাত হানবার সুযোগ নেই।

সাহিত্যের প্রতি সুতীব্র অনুরাগ এবং রুচির ক্ষেত্রে পরিপূর্ণ একতা — এই উভয়ের দ্বারা অনুপ্রাণিত হয়ে 'বিচিত্রা' পরিচালনা বিষয়ে একটি কর্মীসঙ্ঘ অর্থাৎ ওয়ার্কিং ইউনিটি গ'ড়ে উঠেছিল, সে কথা পূর্বে বলেছি। এর জন্য বিশেষ কোনো বিচার-পদ্ধতি অথবা নির্বাচন-নীতি অনুসরণ করবার প্রয়োজন হয় নি। সরস আশ্রয়ের অভ্যন্তরে একটিমাত্র দানাকে অবলম্বন ক'রে অপরাপর দানা যেমন সহজ আগ্রহে আপনা-আপনি বেঁধে ওঠে, সেই প্রক্রিয়া অনুযায়ী আমাদের ইউনিটও স্বতঃসৃষ্ট হয়েছিল।

এই ইউনিটের আমরা সদস্য ছিলাম চারজন,—কান্তিচন্দ্র ঘোষ, অমল হোম, যতিনাথ ঘোষ ও আমি। কিন্তু এই চারজনের মধ্যে একমাত্র আমি ভিন্ন বাকি তিনজনের সাহিত্যের নেশা থাকলেও অর্থোপার্জনের জন্য এক-একটা স্বতন্ত্র পেশাও থাকায় ছুটির দিন ও অবসরকাল ব্যতীত তাঁদের নিকট হতে সাহায্য পাবার উপায় ছিল না। অথচ কাজের পরিমাণ এত বেশি যে, একজন পূর্ণকালিক কর্মীর সহায়তা ভিন্ন সহজে সব কাজ সামলে ওঠা সম্ভব নয়। একজন উপযুক্ত ও মনের মতো কর্মীর জন্য মনে মনে চতুর্দিকে দৃষ্টি সঞ্চালিত করতে লাগলাম।

মনে পড়ল 'সবুজপত্র'-গোষ্ঠীর খ্যাতনামা লেখক বন্ধুবর সতীশচন্দ্র ঘটকের কথা। তখন তিনি এম. এ. ও আইন পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়ে কলিকাতা হাইকোর্টে ওকালতি করছেন। কিন্তু গোলদীঘি-সম্মুখ-বর্তিনী সরস্বতীর দরবারে যতটা সুবিধা করতে পেরেছিলেন, ভাগীরথী-

পার্শ্ববর্তিনী লক্ষ্মীর দরবারে তার কিছুই ক'রে উঠতে পারছেন না। ভাবলাম, শাল-দোশালা-পোলাও-কালিয়ার মরীচিকা-প্রান্তর থেকে বন্ধুকে ফিরিয়ে আনা যাক সহজ অশন-বসনের বাস্তব ভূমিতে। সেখানে বাক্স হয়তো ভরবে না, কিন্তু চিত্তও খালি প'ড়ে থাকবে না। পাকড়াও করবার অভিপ্রায়ে একদিন চুপে চুপে উপস্থিত হলাম ভবানীপুরে সতীশচন্দ্রের বলরাম বসু ঘাট রোডের গৃহে।

বলরাম বসু ঘাট রোড আমার মনে সুমধুর স্মৃতির স্বপ্ন বিস্তার ক'রে আছে। বাল্যের ও যৌবনের অনেকগুলি দিনের অনেক মধুময় স্মৃতি এই পথের তিনটি গৃহের সহিত জড়িত।

তিনটি গৃহের মধ্যে আমার প্রথম পরিচিত গৃহ বন্ধুবর নলিনীমোহন শাস্ত্রীর গৃহ। রাজপথ হতে নিরাপদ নিরালায় অবস্থিত এই গৃহটি মহানগরীর ধ্যানধারণা হতে একেবারে সম্পূর্ণরূপে বিমুক্ত। রাজপথ থেকে প্রথমে এক সঙ্কীর্ণ পথে খানিকটা অগ্রসর হতে হয়। তার পর এক স্থানে সেই সঙ্কীর্ণ পথ অকস্মাৎ এক-তৃতীয়াংশ হয়ে এমন আকার ধারণ ক'রে দুই পার্শ্ববর্তী দুই কক্ষের সু-উচ্চ দেওয়ালের মধ্য দিয়ে এগিয়েছে যে, দু পাশের দেওয়াল দুটি যদি কক্ষের দেওয়াল না হয়ে পর্বতগাত্র হ'ত, তা হ'লে ভৌগোলিক ভাষা অনুসারে পথটির নাম করতে হ'ত—গিরিসঙ্কট। তবে গিরিসঙ্কটের ঊর্ধ্বদেশ অবারিত; এ পথ কিন্তু আবরিত মাথার উপরে অবস্থিত দ্বিতলের কক্ষের দ্বারা। ফলে দিনমানে পথের ভিতর গোধূলির আবছায়া, রাত্রে বর্ষা-অমানিশার তমসা। আলোকের সাহায্য ব্যতিরেকে শুধু এই ভরসায় এগিয়ে চলা যায় যে, শেষ পর্যন্ত মুক্ত স্থানে না গিয়ে প'ড়ে উপায় নেই। দাঙ্গার সময়ে বাড়িটি যৎপরোনাস্তি নিরাপদ। একটু গা-ঢাকা দিয়ে একটা রাইফেল হাতে সুড়ঙ্গের ভিতরপ্রান্তে বসতে পারলে, শুধু দাঙ্গাকারী

দলকেই নয়, দাঙ্গাদমনকারী পুলিসের ফৌজকেও বেশ কিছুক্ষণ ঠেকিয়ে রাখা যায়।

নলিনী আমার বাল্যবন্ধু, সাউথ সুবার্বন স্কুলের এবং কলেজের সে সহপাঠী। গ্রীষ্মের ছুটিতে বাড়ি-ছেড়ে-পালানো স্তব্ধ-ঝাঁঝাঁ মধ্যাহ্নে, পূজার ছুটিতে শিশির-ভেজা শিউলি-ফোটা প্রভাতে—কতদিন কত সময়ে নলিনীর গৃহে নিবিড় বিশ্রম্ভালাপে কাটিয়েছি। নলিনী ছিল কবি, আমি ছিলাম তার ধৈর্যশীল শ্রোতা। ধৈর্যশীল শ্রোতা অথবা পাঠক অবশ্য চিরদিনই কবিতার সর্বোচ্চ মূল্য; কিন্তু যে সময়ের কথা বলছি তখনকার দিনে তাই বোধ করি ছিল তার একমাত্র মূল্য। কবিতার অর্থ যত অপরূপ, যত ঐশ্বর্যশালীই হোক না কেন, সে অর্থের সহিত বাজার-চলতি অর্থের তেমন কোনো যোগাযোগ দেখা যেত না। সাধারণ ক্রেতা দোকানে এসে বই ঘাঁটতে ঘাঁটতে দৈবাৎ কাব্যগ্রন্থ হাতে পেলে অনাবশ্যক মাল বিবেচনায় তৎক্ষণাৎ পরিত্যাগ করত। যে বই পাঠ না করলে সময়ের সাশ্রয় হয়, অর্থ দিয়ে সে বই কেনার কোনো অর্থই হয় না। কবিতার প্রতি এই অনাদর প্রাচীনকালেও বোধ করি দেখা যেত। তাই সে সময়ের জনৈক কবি সম্ভবত নিজেকে সান্ত্বনা দেবার উদ্দেশ্যেই লিখেছিলেন,

কবিতে, ক'রো না দুঃখ
দুর্জনের নিন্দা শুনে,
সুন্দরীর মন্দ গতি
সন্তোষে কি অন্ধজনে?

আমরা যখন স্কুল-কলেজে পড়তাম, তখন বাংলা দেশে এইরকম দুর্জনের ভিড়ের অভাব ছিল না।

অন্য পরে কা কথা, রবীন্দ্র-কাব্যকেও মাঝে মাঝে এ কথার সপক্ষে

সাক্ষ্য দিতে দেখা যেত। কখনো-সখনো সংবাদ পেতাম, গুরুদাস চট্টোপাধ্যায়ের 'বেঙ্গল মেডিক্যাল লাইব্রেরি' নামক পুস্তকালয়ে সিকি মূল্যে রবীন্দ্র-কাব্যগ্রন্থ বিক্রীত হচ্ছে। উপস্থিত হয়ে দেখতাম, ( অন্তত একবার দেখেছিলাম, সে কথা স্পষ্ট মনে আছে ) দোকানের ভিতরে প্রবেশ করবার প্রয়োজন নেই, ফুটপাথের ধারেই টাল করা রয়েছে 'মানসী,' 'সোনার তরী,' 'কড়ি ও কোমল'। দ্বারপার্শ্বে চেয়ারের উপর পাখা হাতে ব'সে আছেন পিরান-গায়ে স্থূলদেহ বৃদ্ধ চাটুজ্জে মশায়।

বই দেখে মনের একটা দিক হ'ত আনন্দিত, একটা দিক বিষণ্ণ। নিজের ক্রয়-সামর্থ্যের মধ্যে বইগুলিকে পাওয়া গেছে ব'লে আনন্দিত হতাম; বিষণ্ণ হতাম দেশের সর্বশ্রেষ্ঠ কাব্যসম্পদের অনাদর দেখে। কিন্তু স্বল্প মূল্যেই বা কিরূপ বিক্রয় হচ্ছে জানবার জন্য বই বাছতে বাছতে সেদিকে লক্ষ্য রাখতে থাকতাম। দেখতাম, তাও এমন কিছুই নয়। একটা লোক যদি কেনে তো দশটা লোক বই তুলে দেখে রেখে দেয়। তখনকার দিনে চার আনায় এক সের পাকা রুইমাছ পাওয়া যেত। সংসার-রুচির দরবারে চার আনার রুইমাছের নিকট চার আনার 'মানসী' পরাজিত হ'ত। মুখের জিহ্বার লোভ দেখে মনের জিহ্বা শুকিয়ে উঠত।

চাটুজ্জে মশায়ের নিকট অনুযোগ করলাম।

ঝানু লোক চাটুজ্জে মশায়, লজ্জা দিতে ছাড়লেন না। বললেন, "বাবা, পোকায় কাটবার আগে তোমরা যদি দয়া ক'রে পুরো দাম দিয়ে কিনতে আসতে, তা হ'লে এ লজ্জা পেতে হ'ত না।"

যত কঠোরই হোক, এত বড় সত্য কথার বিরুদ্ধে কিছু বলতে পারলাম না; অপ্রতিভ স্মিতমুখে চুপ ক'রে দাঁড়িয়ে রইলাম।

অবস্থা দেখে, বোধ করি দয়াপরবশ হয়েই গুরুদাসবাবু বললেন,

"টাটকা বই-ই কেউ সহজে কিনতে চায় না, পুরো দাম দিয়ে এ পোকায়-কাটা বই কে কিনবে বল? এ কখানা বই বিক্রি হয়ে যাক, তার পর আবার নতুন সংস্করণ বার হবে।"

তবু ভাল!

বাড়ি ফিরে তাড়াতাড়ি সজ্জা পরিবর্তন ক'রে জল খেয়ে 'মানসী' খুলে নিশ্চিন্ত মনে পড়তে বসি,—

কে আমারে যেন এনেছে ডাকিয়া,
এসেছি ভুলে।
তবু একবার চাও মুখপানে
নয়ন তুলে।

সরস কাব্যরসের অমৃতস্পর্শ লাভ ক'রে মনের গ্লানি অপহৃত হয়ে যায়।

আজ কিন্তু চাকা বেশ খানিকটা ঘুরেছে। পরিপূর্ণ না হ'লেও, আজ কাব্য তার প্রাপ্য মহিমার অনেকখানি অংশ অর্জন করেছে। উচ্চমূল্যের রবীন্দ্র-কাব্যগ্রন্থ এখন দু হাজার আড়াই হাজার খণ্ডের সংস্করণে মুদ্রিত হয়ে দেখতে দেখতে নিঃশেষিত হয়ে যায়। নূতন পুস্তকের মূল্যহ্রাসের তো কথাই নেই এখন, পুরাতন পুস্তকের দোকানেও রবীন্দ্র-কাব্যগ্রন্থ বড় আর দেখতে পাওয়া যায় না। কদাচিৎ এক-আধখানা দেখতে পাওয়া গেলেও, তার অবনমিত মূল্যের উচ্চতার দাবি দেখে সিকি-মূল্য-দিনের দুঃখ কতকটা বিস্মৃত হওয়া যায়।

বলরাম বসু ঘাট রোডের দ্বিতীয় গৃহ হচ্ছে তদানীন্তন সুবিখ্যাত সাপ্তাহিকপত্র 'হিতবাদী'র সুযোগ্য সম্পাদক কালীপ্রসন্ন কাব্যবিশারদ মহাশয়ের গৃহ। এই গৃহের সহিত আমার দুই বিভিন্ন সময়ে দু রকমের যোগ ছিল। কাব্যবিশারদ মহাশয়ের মৃত্যুর পর তাঁর একমাত্র পুত্র

মনোরঞ্জন বন্দ্যোপাধ্যায়ের তাস ও দাবার সান্ধ্য বৈঠকে প্রায়ই গিয়ে বসতাম। রবিবারে ও ছুটির দিনে সে বৈঠক অপরাহ্ণকালে আরম্ভ হয়ে রাত্রি দশটা সাড়ে দশটা পর্যন্ত চলত। আমি ছিলাম সে বৈঠকে তাস খেলার দর্শক ও দাবা খেলার শরিক। সুবিস্তৃত ফরাশের অধিকাংশ স্থান অধিকার ক'রে বসত তাসের আসর। তাদের খেলোয়াড়ও চারজন, দর্শক সংখ্যাও বেশি। অদূরে ফরাশের এক নিভৃত কোণে বসত আমাদের দাবার শীর্ণ বৈঠক। তাসের আসরে চলত কাগজের সাহেব-বিবি-গোলামের দুরন্ত যুদ্ধ ; আমাদের দাবার বৈঠকে চলত কাঠের রাজা-মন্ত্রী-গজের নিঃশব্দ সংগ্রাম। সাফল্য-নৈষ্ফল্যের উদ্দীপনায়, জয়-পরাজয়ের উত্তেজনায় তাসের আসরে উঠত উদ্দাম কোলাহল ; দাবার বৈঠকে সামান্য ভ্রূকুঞ্চন। উভয় রণক্ষেত্রের তন্ত্রই আলাদা।

কাব্যবিশারদ মহাশয়ের জীবদ্দশায় তাঁর গৃহে আমার প্রবেশ ছিল একজন গায়করূপে। তখন স্বদেশী-আন্দোলনের যুগ। স্বদেশমন্ত্রে দীক্ষিত হয়ে সারা বাংলা দেশ জীবন পণ ক'রে বসেছে। সে পণের মন্ত্র তখন 'করব অথবা মরব' ভাষা গ্রহণ করে নি ; তার ভাষা তখন আরও কঠোর আরও নির্মম,—'মারব অথবা মরব'। গীতার নিষ্কাম ধর্মকে অন্তরে অন্তরে গ্রহণ ক'রে বাংলার যুবক জীবন-মরণকে একই দৃষ্টিতে দেখতে শিখেছে ;—তা সে-জীবন নিজেরই হোক অথবা পরের। শিকল ভাঙার ঝন্‌ঝনানি শোনবার জন্য সে তখন উৎকর্ণ। বাধা-বিঘ্ন চূর্ণ করবার জন্য তার দুই হস্ত উদ্যত। 'আনন্দমঠ' থেকে সে শুধু "বন্দে মাতরম্" বীজমন্ত্র গ্রহণ ক'রেই নিরস্ত হয় নি, সন্তান-ধর্মের সমগ্রতা দিয়ে সে তার হৃদয়কে পরিপূর্ণভাবে আচ্ছন্ন করেছে।

অগ্নিযুগের এই দীপ্ত মুহূর্তে যে-বস্তু সর্বাধিক দ্রুত এবং দুর্বার গতিতে বাংলার জনমনকে স্বদেশ-প্রেরণায় অনুপ্রাণিত করত, তা বোধ করি স্বদেশী

গান। রবীন্দ্রনাথ নিত্য-নূতন গান রচিত ক'রে বাঙলীকে দেশপ্রেমে দীক্ষিত করতে লাগলেন। অপরাপর কবিদের লেখনীও এ বিষয়ে অলস রইল না। দেখতে দেখতে স্বদেশী-আন্দোলনের যুগ স্বদেশী গানের যুগ হয়ে দাঁড়াল। বাংলা দেশের আকাশ বাতাস পরিব্যাপ্ত হয়ে গেল স্বদেশ-প্রেমের অপরূপ গানে।

এইরূপ গানের দ্বারা স্বদেশপ্রেম বিকীর্ণ করবার দক্ষিণ-কলিকাতার প্রধান প্রচারকেন্দ্র ছিল কাব্যবিশারদ মহাশয়ের গৃহ। সম্ভবত বেতন দিয়ে কাব্যবিশারদ মহাশয় তাঁর গৃহে দুটি সুগায়ককে নিযুক্ত রেখেছিলেন। সভা-সমিতিতে তাঁদের গান করতে হ'ত; তা ছাড়া, নগর-সঙ্গীতও তাঁরা করতেন। নগর-সঙ্গীতের সময়ে তাঁরা হতেন মূল গায়েন, আমরা বিশ-পঁচিশ জন মিলে পিছন থেকে সমস্বরে দোহারকি করতাম। অতগুলি মিলিত কণ্ঠের সুর-সমষ্টি কলিকাতার রাজপথের আকাশ-বাতাসকে একটা গভীর উদ্দীপনায় কাঁপাতে থাকত। তার ছোঁয়াচ পেয়ে পথপার্শ্বের দুর্বলতম হৃদয়ও দেশোদ্ধারের দুষ্কর আহবে ঝাঁপিয়ে পড়বার প্রেরণা বোধ করত।

গান আমরা কয়েকটি গাইতাম, তার মধ্যে কাব্যবিশারদ মহাশয়ের রচিত একটি গান জনপ্রিয় হয়ে উঠেছিল ব'লে সর্বদাই গাইতে হ'ত। গানটির মুখপাত এইরূপ—

আমার যায় যেন জীবন চ'লে,
জগৎ মাঝে তোমার কাজে
বন্দে মাতরম্ ব'লে।

যত দূর মনে পড়ছে, বলরাম বসু ঘাট রোডে সতীশদের পাঁচ নম্বরের বাড়ি। বিস্তৃত জমি, সাবেককেলে বৃহৎ বাড়ি, বৃহৎ পরিবার। তবে সবটাই একান্নবর্তী নয়,—কয়েক দলে বিভক্ত। সে সময়ে এ বাড়ির

সকলের কাছেই আমি পরিচিত—কর্তাদের থেকে আরম্ভ ক'রে ছোট ছেলেমেয়ে পর্যন্ত সকলের নিকট। কত শীত-গ্রীষ্ম, কত সন্ধ্যা-সকাল গল্পে গানে সাহিত্য-আলোচনায় সতীশের সঙ্গে এ বাড়িতে আমার অতিবাহিত হয়েছিল, তার ইয়ত্তা নেই।

বেলা তখন নটা হবে, সতীশদের বাইরের অঙ্গনে দাঁড়িয়ে ডাকলাম, "সতীশ আছ ?"

ঘর থেকে বেরিয়ে এসে আমাকে দেখে হর্ষোজ্জ্বল মুখে সতীশ বললে, "উপেন ? কি সৌভাগ্য! এস, এস। ঘরের মধ্যে এস।"

ঘরের ভিতর গিয়ে উপবেশন ক'রে বললাম, "তোমার সঙ্গে একটা কথা আছে।"

সতীশ বললে, "একটা কেন, অনেক কথা আছে। কিন্তু তার আগে আমার কয়েকটা কথা আছে তোমার সঙ্গে।"

জিজ্ঞাসা করলাম, "কি কথা ?"

সতীশ বললে, "আজ এ বেলা আহার করবে তুমি।"

বললাম, "রাজী।"

"আজ দুপুরে এখানে থাকবে।"

"রাজী।"

"আজ বিকেলে চা খেয়ে তারপর এখান থেকে যাবে।"

"রাজী।"

সতীশ বললে, "আচ্ছা, এবার তা হ'লে তোমার কথা বল।"

সবিস্তারে সকল কথা বললাম। শুনে সতীশের মুখ-চক্ষু আনন্দে উদ্ভাসিত হয়ে উঠল ; বললে, "তিনবার রাজী।"

ছিলাম আমরা চারজন, সতীশ যোগ দেওয়ায় হলাম পাঁচজন। পাঁচ

সংখ্যা লক্ষ্য ক'রে কেউ কেউ আমাদের নাম দিতে লাগল—পঞ্চপাণ্ডব ; আর 'বিচিত্রা' দ্রৌপদী।

পঞ্চপাণ্ডবের মধ্যে ভীম আর অর্জুন কে ছিল, সে গবেষণা এখন নিষ্প্রয়োজন। তবে একান্তই যদি পঞ্চপাণ্ডবের উপমা মানতে হয় তো কান্তিচন্দ্র ছিলেন যুধিষ্ঠির, তার প্রমাণ একদিন পাওয়া গিয়েছিল।

বৈশাখ মাস হতে ধীরে ধীরে 'বিচিত্রা'র মুদ্রণকার্য আরম্ভ হ'ল। মুদ্রণকার্যের প্রধান ভার পড়ল শ্রীযুক্ত অমল হোমের উপর। অমলবাবু তখন 'ক্যালকাটা মিউনিসিপাল গেজেটে'র সম্পাদক। 'ক্যালকাটা মিউনিসিপাল গেজেটে'র বিশেষ সংখ্যাগুলিতে মুদ্রণ বিষয়ে তাঁর উন্নত জ্ঞান এবং সুরুচির প্রচুর পরিচয় পাওয়া যেত।

সর্বপ্রথমে অমলবাবু 'বিচিত্রা'র একটি ডামি প্রস্তুত করাতে মনোযোগী হলেন। ডামি অর্থে 'বিচিত্রা' যেমন হবে আকারে এবং প্রকারে, তার অবিকল প্রতিকৃতি। 'বিচিত্রা'র আকার ছিল ডবল-ক্রাউন আট-পেজি ; আয়তন ছিল বিষয়বস্তু একুশ ফর্মা এবং পাঁচ ফর্মা বিজ্ঞাপন, মোট ছাব্বিশ ফর্মার। ডামিরও করা হ'ল সেই একই আকার ও আয়তন। কভারে বৃহৎ অক্ষরের ব্লকে 'বিচিত্রা' নাম। তার নিম্নে যথাস্থানে মুদ্রিত : "প্রথম বর্ষ, প্রথম খণ্ড—আষাঢ় ১৩৩৪, প্রথম সংখ্যা"। তার নিচে বড় বড় অক্ষরে সম্পাদকের নাম। বিষয়বস্তুর প্রথম পৃষ্ঠার সম্মুখে ত্রিবর্ণ ব্লকে মুদ্রিত রঙিন চিত্র, বিষয়বস্তুর মাঝামাঝি স্থানে আর একখানি রঙিন চিত্র। তা ছাড়া, একখানি পূর্ণপৃষ্ঠ দুই-রাঙা ছবি। দক্ষিণ দিকের পাতার শীর্ষদেশে প্রবন্ধ ও লেখকের নাম, বাম দিকের পাতায় ব্লকে ছাপা 'বিচিত্রা'র নাম। পাতাগুলি সবই প্রায় সাদা ; তবে কোনো কোনো প্রবন্ধ অথবা কবিতার খানিকটা ক'রে অংশ ছাপা। বিজ্ঞাপনের পৃষ্ঠাগুলিরও অধিকাংশই খালি। শুধু যে-বিজ্ঞাপনদাতাদের সহিত বিজ্ঞাপনের চুক্তি হয়ে গিয়েছে অথবা হয়ে এসেছে, তাদের বিজ্ঞাপন মুদ্রিত করা হয়েছে। ডামি দেখিয়ে বিজ্ঞাপন আদায় করা এবং বিজ্ঞাপনের দর নির্ণয় করা ডামি প্রস্তুত করবার প্রধান উদ্দেশ্য।

দফ্‌তরির বাড়ি থেকে দু শো আড়াই শো কপি বাঁধিয়ে এলে ডামির নীলরেখাঙ্কিত দুগ্ধশুভ্র মূর্তি দেখে চোখে জুড়িয়ে গেল। বোবারই এত মহিমা,—এ যখন মুখর হবে, তখন না-জানি কি কাণ্ডই উৎপন্ন করবে! আষাঢ়স্য প্রথম দিবসে আবির্ভূত হবার জন্যে যে চারুরূপিণী 'বিচিত্রা' তার গোপন কক্ষে উপস্থিত প্রসাধনরতা,—এ যেন তার পূর্বাভাস, তার ছায়া। উৎকৃষ্ট পুরু শুভ্র আর্ট পেপারের উপর পীকক্ ব্লু কালিতে ছাপা প্রচ্ছদ। তার অপূর্ব শ্রীর মধ্যে এমন অনাড়ম্বর আভিজাত্যের প্রকাশ যে, সত্য কথা যদি বলতে হয়, আসল 'বিচিত্রা'র জমকালো প্রচ্ছদের মধ্যে সে আভিজাত্যের ততটা সন্ধান পাই নি।

মাসিকপত্রের ডামি আমার অভিজ্ঞতায় ইতিপূর্বে আমি কখনো দেখি নি, পরেও না। দেখলাম, আমার মতো অনেকেই দেখে নি। যাকে দেখাই সে-ই চমকে ওঠে। বড় চমকানির কাহিনীটা এবার বলি।

ডামি যখন প্রকাশিত হ'ল তখন হয় বৈশাখ মাসের শেষ, নয় জ্যৈষ্ঠ মাসের আরম্ভ। এক খণ্ড ডামি নিয়ে জোড়াসাঁকোয় ৬ নং দ্বারিকানাথ ঠাকুর লেনে আমরা উপস্থিত হলাম। রবীন্দ্রনাথ তখন কলিকাতায় অবস্থান করছেন। 'বিচিত্রা'র প্রথম সংখ্যায় চৌষট্টি পাতা জুড়ে রবীন্দ্রনাথের সমগ্র কাব্য "নটরাজ-ঋতুরঙ্গশালা" প্রকাশিত হবে। তার প্রত্যেকটি পাতা শিল্পাচার্য নন্দলাল বসু কর্তৃক অঙ্কিত অলঙ্কারচিত্রের দ্বারা সজ্জিত। কাব্যের মধ্যস্থলে অনুপ্রবিষ্ট নন্দলাল-অঙ্কিত ঋতুরাজ বসন্তের বহুবর্ণ চিত্র,—যে বসন্তকে রবীন্দ্রনাথ আবাহনের প্রথম মন্ত্রে বলছেন,

হে বসন্ত, হে সুন্দর, ধরণীর ধ্যান-ভরা ধন!
বৎসরের শেষে
শুধু একবার মর্ত্যে মূর্তি ধরো ভুবন-মোহন
নব বরবেশে।

তারি লাগি' তপস্বিনী কি তপস্যা করে অনুক্ষণ,
আপনারে তপ্ত করে, ধৌত করে, ছাড়ে আভরণ,
ত্যাগের সর্বস্ব দিয়ে ফল-অর্ঘ্য করে আহরণ
তোমার উদ্দেশে ॥

নন্দলাল বসুর দ্বারা অলঙ্কৃত রবীন্দ্রনাথের কাব্য! সাময়িকপত্রের ইতিহাসে এমন মণিকাঞ্চনের যোগ এ পর্যন্ত কখনো হয় নি ব'লেই আমার বিশ্বাস, আর অদূরভবিষ্যতে হতে পারবে না ব'লে আশঙ্কা। তবে কাল নিরবধি, সুতরাং কোনো দিন হতে পারবে না, সে কথাই বা কি ক'রে বলতে পারি?

আমরা যখন রবীন্দ্রনাথের কাজ করবার ঘরে টেবিলের সামনে উপস্থিত হলাম, তখন রবীন্দ্রনাথ টেবিলের সম্মুখে চেয়ারে ব'সে "নটরাজে"রই প্রুফ দেখছেন। "নটরাজ" 'বিচিত্রা'র প্রথম সংখ্যায় প্রকাশিত হবে এবং সে প্রথম সংখ্যা বাজারে প্রকাশিত হবে পয়লা আষাঢ় অর্থাৎ অন্তত, মাসাবধি কাল পরে, এ চেতনা আমাদের অপেক্ষা রবীন্দ্রনাথের কিছুমাত্র কম ছিল না। কিন্তু চেতনা যতই স্পষ্ট এবং পর্যাপ্ত হোক না কেন, চোখের সম্মুখে দেদীপ্যমান কাগজের তৈরি বৃহৎ একখণ্ড ডামির মতো তার তো আকার আয়তন এবং ওজন নেই; তাই সহসা যখন রবীন্দ্রনাথের সম্মুখে টেবিলের উপর নিঃশব্দে একখানা ডামি স্থাপন করলাম, উৎকট বিস্ময়ে চমকিত হয়ে তিনি ব'লে উঠলেন, "এই! বেরিয়ে গেল না-কি!" অত বড় স্থূল প্রত্যক্ষের কাছে বেরিয়ে যাবার পক্ষে সকল অসম্ভাব্যতা পরাস্ত হ'ল। তিনি যে সে সময়ে প্রথম সংখ্যায় প্রকাশনীয় লেখার প্রুফ দেখার কার্যে রত রয়েছেন, সে কথাও সাময়িকভাবে বিস্মৃত হলেন।

সকৌতুক বিস্ময়ের পরবর্তী উচ্ছ্বাস উপভোগ করবার প্রলোভনে

আমরা কষ্টে হাস্যরোধ ক'রে নিঃশব্দে দাঁড়িয়ে রইলাম। প্রত্যাশা ব্যর্থ হ'ল না। ডামি খুলে পাতার পর পাতা ফর্ ফর্ ক'রে উলটে সাদা পাতা দেখে রবীন্দ্রনাথ সমুচ্চ কণ্ঠে হেসে উঠলেন। সে হাসি শুধু কৌতুকেরই হাসি নয়, সে হাসির মধ্যে নিশ্চিন্ততার একটা উন্মুক্ত আনন্দ। রবীন্দ্র-নাথের সেদিনকার সেই প্রাণ-খোলা হাসির ধ্বনি এখনো আমার কানে লেগে আছে।

'তিন পুরুষ' উপন্যাস (পরে 'যোগাযোগ') রবীন্দ্রনাথ আমাদের অনুরোধক্রমে লিখেছিলেন। 'নটরাজ' কিন্তু তিনি স্বতঃ-প্রণোদিত হয়েই লিখেছিলেন। একটি সমসাময়িক মাসিকপত্রিকার কর্তৃপক্ষ সেটি অধিকার করবার জন্য চেষ্টা করছিলেন। ছ শো টাকা পর্যন্ত পারি-শ্রমিক দেবার প্রস্তাব ক'রে তাঁরা ইতস্তত করেছিলেন অবগত হয়ে আমরা একেবারে এক সহস্র টাকার একখানি চেক নিয়ে গিয়ে 'নটরাজ' হস্তগত করি।

'যোগাযোগ' উপন্যাস 'বিচিত্রা'য় প্রকাশ করবার জন্য আমরা রবীন্দ্র-নাথকে তিন সহস্র টাকা দক্ষিণা দিয়েছিলাম। এই দক্ষিণার প্রসঙ্গে একদিন তিনি আমাকে বলেছিলেন, "তোমাদের দেওয়া এ দক্ষিণা আমাদের দেশের পক্ষে সুষ্ঠু (decent)।" আমার বেশ মনে আছে, রবীন্দ্রনাথ তাঁর কথার মধ্যে ইংরেজী 'decent' কথাটি ব্যবহার করেছিলেন।

তিন হাজার টাকার দক্ষিণান্ত করবার সময়ে রবীন্দ্রনাথের উপন্যাসের নাম ছিল 'তিন পুরুষ'। অবশ্য এই 'তিন হাজার' এবং 'তিন পুরুষ'-এর মধ্যে আসলে অর্থগত কোনো যোগাযোগ ছিল না, সে কথা বলাই বাহুল্য। ওটা দাঁড়িয়েছিল নিতান্তই দৈবযোগের ব্যাপার। ১৩৩৪ সালের আশ্বিন মাসের 'বিচিত্রা'য় 'তিন পুরুষে'র প্রথম কিস্তি প্রকাশিত হ'ল ;

কার্তিক মাসে দ্বিতীয় কিস্তি। অগ্রহায়ণ মাসের তৃতীয় কিস্তি থেকে 'তিন পুরুষে'র নাম পরিবর্তিত হয়ে হ'ল 'যোগাযোগ'। ৪ঠা অক্টোবর ১৯২৭ শ্যামের পথে "কিন্তা" জাহাজে ব'সে রবীন্দ্রনাথ এই পরিবর্তন করেন।

নামান্তরের কৈফিয়ৎস্বরূপ অগ্রহায়ণের 'বিচিত্রা'য় 'যোগাযোগে'র কিস্তি আরম্ভ করবার পূর্বে রবীন্দ্রনাথ যে ভূমিকাটুকু যোগ করেছিলেন, নাম-রহস্য সম্বন্ধে সেটিকে একটি ক্ষুদ্র উপাদেয় সন্দর্ভ বলা চলে। উক্ত ভূমিকায় রবীন্দ্রনাথ বলেছিলেন,—

"...ব্যক্তিগত নাম ডাকবার জন্যে, বিষয়গত নাম স্বভাব নির্দেশের জন্যে। মানুষকেও যখন ব্যক্তি ব'লে দেখি নে, বিষয় ব'লে দেখি, তখন তার গুণ বা অবস্থা মিলিয়ে তার উপাধি দিই, কাউকে বলি বড়বউ, কাউকে বলি মাস্টার মশায়।

"সাহিত্যে যখন নামকরণের লগ্ন আসে, দ্বিধার মধ্যে পড়ি। সাহিত্য রচনার স্বভাবটা বিষয়গত না ব্যক্তিগত এইটে হ'ল গোড়াকার তর্ক। বিজ্ঞানশাস্ত্রে বিষয়টাই সর্বেসর্বা, সেখানে গুণধর্মের পরিচয়ই একমাত্র পরিচয়।...বিষয়ের কাছ থেকে সংবাদ পাই, ব্যক্তির কাছ থেকে তার আত্মপ্রকাশজনিত রস পাই। বিষয়কে বিশেষণের দ্বারা মনে বাঁধি। ব্যক্তিকে সম্বোধনের দ্বারা মনে রাখি।

....রসশাস্ত্রে মূর্তিটা মাটির চেয়ে বেশি, গল্পটাও বিষয়ের চেয়ে বড়। এইজন্য বিষয়টাকেই শিরোধার্য ক'রে নিয়ে গল্পের নাম দিতে আমার মন যায় না।...

"এদিকে সম্পাদক এসে বলেন, সংসারে নাম রূপ দুটোই অত্যাবশ্যক। আমি ভেবে দেখলুম, রূপের আমরা নাম দিই, বস্তুর দিই সংজ্ঞা। সন্দেশ যেখানে রূপ, সেখানে তাকে বলি 'অবাকচাকি'; যেখানে বস্তু, সেখানে তাকে বলি মিষ্টান্ন।..

"সম্পাদক মশায় যখন গল্পের নামের জন্যে পেয়াদা পাঠালেন, তাড়াতাড়ি তখন 'তিন পুরুষ' নামটা দিয়ে তাকে বিদায় করা গেল। তার পরক্ষণেই নামটা কাহিনীর আঁচলের সঙ্গে তার গ্রন্থিবন্ধন ক'রে নিয়ে কানে কানে মুহূর্তে মুহূর্তে বলতে লাগল, 'যদেতৎ অর্থং মম তদস্তু রূপং তব।' আমার সঙ্গে তোমাকে সম্পূর্ণ মিলে চলতে হবে। কাহিনী বলে, 'তার মানে কি হ'ল?' নাম বলে, 'বাক্যে ভাবে আজ থেকে আমাকে সপ্রমাণ ক'রে চলাই তোমার ধর্ম।' কাহিনী বলে, 'রেজিস্টার বইয়ে কর্তার তাড়ায় সম্মতি সই করেছি বটে, কিন্তু আজ আমি হাজার হাজার পাঠকের সামনে দাঁড়িয়েই সেটা বেকবুল যেতে চাই।'

"কর্তা বলেন, তিন পুরুষের তিন তোরণওয়ালা রাস্তা দিয়ে গল্পটা চ'লে আসবে এই আমার একটা খেয়াল মাত্র ছিল। এই চলাটা কিছুই প্রমাণ করবার জন্যে নয়, নিছক ভ্রমণ করবার জন্যেই। সুতরাং এই নামটা ত্যাগ করলে আমার গল্পের কোনো স্বত্বের দলিল কাঁচবে না।

"অতএব সর্বসমক্ষে আমার গল্প আজ তার নাম খোয়াতে বসেছে। আমরা তিন সত্যের জোর মানি। 'বিচিত্রা'র পাতায় নাম সম্বন্ধে দুইবার সত্য পাঠ হয়ে গেছে। তিনবারের বেলায় মুখ চাপা দেওয়া গেল।

"আর একটা নাম ঠাউরেচি। সেটা এতই নির্বিশেষ যে, গল্পমাত্রেই নিবিচারে খাটতে পারে।...গল্প নিজেই নিজের পরিচয় দেবার সাহস রাখে যেন, নামটাকে যেন জোর গলায় আগে আগে নকীবগিরি করতে না পাঠায়।

"তিন পুরুষ নাম ঘুচিয়ে আমার গল্পের নাম দেওয়া গেল—যোগাযোগ।"

'তিন পুরুষ' নাম বজায় রেখেও কাহিনীকে নামের তাঁবেদারি না

করিয়েও সার্থক উপন্যাস রচনা করা রবীন্দ্রনাথের পক্ষে কঠিন ছিল না। নাম পরিবর্তনের সপক্ষে তাঁকে অতটা ওকালতি করতে হয়েছিল, বোধ করি তাঁর প্রদর্শিত কারণটাই নাম পরিবর্তনের প্রকৃত, অন্তত প্রধান, কারণ ছিল না ব'লে। একটা অন্য কারণের কথা আমাদের কর্ণগোচর হয়েছিল। কিন্তু রবীন্দ্রনাথ যখন তাঁর নামান্তরের ভূমিকায় তার উল্লেখ করেন নি, তখন সে বিষয়ে কোনো প্রকার উচ্চবাচ্য না করাই সমীচীন।

১৩৩৪ সালের ১লা আষাঢ় আমার জীবনের একটি স্মরণীয় দিন। বহুকাল হতে মনে মনে যে স্বপ্ন দেখে এসেছিলাম, সেদিন তা সুমধুর বাস্তবে পরিণত হয়েছিল। কি রকম সুমধুর, 'বিচিত্রা'র প্রথম সংখ্যার সূচীপত্র থেকে তার একটু ইঙ্গিত দিলে অন্যায় হবে না।

প্রথমেই রবীন্দ্রনাথ কর্তৃক 'বিচিত্রা'র জন্য বিশেষভাবে রচিত "বিচিত্রা" নামক চার পৃষ্ঠাব্যাপী কবিতা—কবির হস্তলিপিতে মুদ্রিত; তার পরে প্রসিদ্ধ চিত্রশিল্পী নন্দলাল বসু কর্তৃক চিত্রভূষণে অলঙ্কৃত রবীন্দ্রনাথের চৌষট্টি পৃষ্ঠাব্যাপী অপরূপ খণ্ডকাব্য "নটরাজ—ঋতুরঙ্গশালা" এবং তৎপরে শিল্পাচার্য অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর রচিত প্রবন্ধ "নতুন ও পুরানোর ছন্দ"; স্বনামখ্যাত সাহিত্যিক অতুলচন্দ্র গুপ্ত রচিত প্রবন্ধ "ইতিহাস"; সুপ্রসিদ্ধ সাহিত্যিক প্রমথ চৌধুরী রচিত প্রবন্ধ "পূর্ব ও পশ্চিম"; ডক্টর প্রবোধচন্দ্র বাগচী লিখিত সচিত্র প্রবন্ধ "ইন্দো-চীন ভ্রমণ"; রায় বাহাদুর সুরেন্দ্রনাথ মজুমদারের ছোটগল্প "ভৌতিক প্রেম"; ডক্টর শিশিরকুমার মিত্রের সচিত্র প্রবন্ধ "বেতারবার্তা"; ডক্টর নরেশচন্দ্র সেনগুপ্তর উপন্যাস "সতী"; দিনেন্দ্রনাথ ঠাকুরের নটরাজের স্বরলিপি; এবং আরও অনেক।

চিত্র-তালিকার মধ্যে বলা যেতে পারে, খ্যাতনামা শিল্পী চারুচন্দ্র রায় অঙ্কিত বহুবর্ণ প্রচ্ছদ; শিল্পাচার্য অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর অঙ্কিত বহুবর্ণ চিত্র 'কুমারী'; নটরাজ-কাব্যের সূচনা-চিত্র নটরাজ-রচনা-নিরত রবীন্দ্রনাথ; নন্দলাল বসু অঙ্কিত বহুবর্ণ চিত্র 'বসন্ত'; গগনেন্দ্রনাথ ঠাকুর অঙ্কিত দ্বিবর্ণ চিত্র 'ভোরের আলো'; তদ্ভিন্ন কয়েকটি সচিত্র প্রবন্ধের অন্তর্ভুক্ত বহু তথ্যসম্বলিত কৌতূহলোদ্দীপক চিত্রাবলী।

এই বস্তুনিচয়কে যদি সুমধুর বাস্তব ব'লে থাকি, আশা করি, অন্যায় করি নি।

বেলা এগারোটা আন্দাজ দফ্‌তরি-বাড়ি থেকে বাঁধাই হয়ে হয়ে হাজার হাজার 'বিচিত্রা' আসতে আরম্ভ করলে। আপিসের কর্মচারী, দারোয়ান, চাকর-বাকরদের মধ্যে একটা আনন্দময় কর্মব্যস্ততার সাড়া জেগে উঠল। কর্তাদের সংযত মুখের অধরপ্রান্তে অবরুদ্ধ হাসি। মাস চারেকের কঠিন দাঁড়-বাওয়ার পরে আজ তরী প্রথম ঘাটে ভিড়ে মাল ছাড়তে আরম্ভ করেছে। পণ্যের কমনীয় শ্রীর দ্বারা আপিস উজ্জ্বল হয়ে উঠল।

শহরের বড় বড় চৌরাস্তার বাঙালী ও বিহারী দোকানদারেরা দাম চুকিয়ে দিয়ে ক্যাশ-মেমো কাটিয়ে হাতে নিয়ে উদ্‌গ্রীব হয়ে অপেক্ষা করছিল। বই পৌঁছতেই তারা চঞ্চল হয়ে উঠল। ক্যাশ-মেমোটা এগিয়ে ধ'রে একজন বললে, "মাল এসে গেছে বাবু্। আমার সোজা হিসেব—দু শো। আমাকে ছেড়ে দিন।"

গম্ভীর মুখে কর্মচারী বললেন, "ব্যস্ত ক'রো না বাপু, আগে মাল ঘরে উঠুক, থাক্‌বন্দি হয়ে গোনাগুনতি চুকুক, তার পর একে একে সবাই পাবে।"

এস্‌প্ল্যানেডের বড় খদ্দের পাতিরাম পাঁচ শো কপির ক্যাশ-মেমো কাটিয়ে এক পাশে ব'সে ছিল; সে বললে, "বে-ইনসাফ করবেন না বাবু, খরিদ যতই হোক না কেন, ক্যাশ-মেমোর নম্বর মোতাবিক মাল ছাড়বেন।"

পুস্তকের প্রতি 'মাল' শব্দের প্রয়োগে এখন অভ্যস্ত হয়ে গেছি; সেদিন কিন্তু ব্যাপারটা কানে পীড়া দিয়েছিল, কারণ তার পূর্বে আর কখনো ওরূপ ব্যবহার শুনি নি।

ঘরে প্রবেশ ক'রে দেখি, ইত্যবসরে কে পাঁচ খণ্ড 'মাল' আমার টেবিলের উপর স্থাপন ক'রে গেছে। সাগ্রহে একখানা তুলে নিয়ে খুলতে প্রথমেই চোখে পড়ল—

ছিলাম যবে মায়ের কোলে
বাঁশি বাজানো শিখাবে ব'লে
চোরাই ক'রে এনেছ মোরে তুমি,
বিচিত্রা হে, বিচিত্রা,
যেখানে তব রঙের রঙ্গভূমি।

আশ্চর্য! ব্লক করতে পাঠাবার পূর্বে অন্তত বার পাঁচেক কবিতাটি পড়েছিলাম। কিন্তু এখানকার মতো তখন মনে হয় নি। এর মধ্যে কবি যেন আমার মনের সুরের সন্ধানটিও খুঁজে বার করেছেন।

১৫

১৩৩৪ সালের ১লা আষাঢ় আমার জীবনের একটি স্বর্ণরেখাঙ্কিত দিন, সে কথা পূর্বেই বলেছি। ট্রামে, আত্মীয়স্বজন বন্ধু-বান্ধবের গৃহে, যেখানেই যাই 'বিচিত্রা'র কথা শুনি। বাংলা দেশ জুড়ে একটা সাড়া প'ড়ে গেছে।

একটা নেশা লেগে গেছে আমার। বিক্রয়ের বহর ও গতি দেখবার জন্য কলিকাতার মোড়ে মোড়ে গিয়ে দাঁড়িয়ে থাকি; কখনো হ্যারিসন রোড কলেজ স্ট্রীটের মোড়ে, কোনোদিন শিয়ালদা স্টেশনের চৌরাস্তায়, কখনো এস্‌প্ল্যানেডে ট্রাম কোম্পানির চত্বরে, কখনো বা বউবাজার-ওয়েলিংটনের চৌমাথায়। রেলের হুইলার কোম্পানি আমাদের বড় খদ্দের। হাওড়া স্টেশনে হুইলালের বুকস্টলের অদূরে দাঁড়িয়ে ক্রয়-বিক্রয় লক্ষ্য করি। থাক্‌বন্দি হয়ে স্তূপাকারে 'বিচিত্রা' সজ্জিত। খদ্দের এসে সকলের ওপরকার 'বিচিত্রা'খানা তুলে দেখতে আরম্ভ করে। প্রথমে ছবি দেখে, তার পর লেখা। স্তূপের উপর এলোমেলোভাবে কাগজখানা রাখলেই বুঝি, সুরাহা। পরবর্তী কাজ বুকপকেট থেকে মনিব্যাগ বার ক'রে আট আনা পয়সা বার করা। খুশিতে মন ভ'রে ওঠে। কিন্তু স্তূপের উপর সযত্নে সমান ক'রে সাজিয়ে রাখলেই বুঝি, বেগতিক। সে যত্ন প্রত্যাখ্যানের যত্ন, ফেলে রেখে যাবার উদ্যোগ। মনে মনে সিদ্ধান্ত করি, উল্টে-পাল্টে দেখে যে ব্যক্তি কেনে না, সে হয় কৃপণ, নয় অরসিক।

একদিনের একটি কৌতুকজনক ঘটনা স্পষ্ট মনে আছে। দক্ষিণগামী ট্রামের অপেক্ষায় হ্যারিসন রোড কলেজ স্ট্রীট সংযোগের উত্তর-পূর্ব কোণে দাঁড়িয়ে আছি। পিছনেই ফুটপাথের উপর দুটি বাঙালী যুবকের

খাতাপত্র, দৈনিক খবরের কাগজ ও মাসিকপত্রাদির দোকান। যুবক দুটির আকৃতি দেখে মনে হয়, দুজনে সহোদর ভাই।

দোকানের কাঠের তাকের ওপর দুই থাক্ 'বিচিত্রা'; মোট-সংখ্যা শ৷ দেড়েকের কম হবে না। দোকান থেকে এক-একখানা ক'রে বিক্রয় হচ্ছে; তা ছাড়া পশ্চিমা হকাররা সেই দোকান থেকে নিয়ে নিয়ে দৌড়োদৌড়ি হাঁকাহাঁকি ক'রে ট্রামের আরোহী ও পথচারীদের বিক্রয় করছে। আমি পরিতোষসহকারে নিরীক্ষণ করছি, এমন কি দুই-একটা ট্রাম ছেড়েও দিচ্ছি।

এমন সময়ে এক ব্যক্তি এসে দোকানদার দুজনের সঙ্গে গল্প লাগালে। খরিদ্দার নয়; কথোপকথন থেকে মনে হ'ল, দোকানদারদের সঙ্গে ঘনিষ্ঠতা আছে; হয়তো তার নিজের স্টলও কোথাও থাকতে পারে। এক সময়ে আগন্তুক বললে, "বইটা কিন্তু বেশ বিক্রি হচ্ছে।"

দোকানদারদের মধ্যে একজন জিজ্ঞাসা করিলে, "কোন্ বই? 'বিচিত্রা'?"

"হ্যাঁ।"

এতক্ষণ কানে যা আলগাভাবে প্রবেশ করছিল, কিছু কিছু তার শুনেছিলাম; 'বিচিত্রা'র কথা শুনে কান খাড়া করলাম, বিশেষ ক'রে বাম কান। দৃষ্টি কিন্তু চৌমাথার দক্ষিণ-পশ্চিম কোণে অবস্থিত অদূরবর্তী ওয়াই. এম. সি. এ.র ইমারতের উপর এমন প্রগাঢ়ভাবে নিবদ্ধ রাখলাম যে, মন যে তখন বিষয়ান্তরে লিপ্ত থাকতে পারে, তা বোঝবার কোনো লক্ষণই প্রকাশ রইল না।

দোকানদার বললে, "নতুন বই, কিছু বিক্রি হবে বইকি। তবে বেশিদিন নয়। ভাদ্র মাসে আর ও-বই বেরোবে না।"

সর্বনাশ! বলে কি! দৈবজ্ঞ না কি? ওয়াই. এম. সি. এ.র উপর

হতে অপসারিত হয়ে দৃষ্টি নিমেষের মধ্যে এসে দাঁড়াল কৃষ্ণদাস পালের মূর্তির উপর।

কৌতূহলী হয়ে আগন্তুক জিজ্ঞাসা করলে, "কেন বল দেখি, ভাদ্র মাসে বই বেরোবে না কেন ?"

দোকানদার বললে, "আড়াই হাজার টাকা নিয়ে নেবেছে, তার মধ্যে দু হাজার খরচ হয়ে গেছে। বাকি পাঁচ শোতে ধার-ধোর ক'রে কোনো রকমে শ্রাবণের কাগজটা বেরোবে; তার পর ভাদ্রের কাগজ আর বেরোবে না।"

একেবারে পরিচ্ছন্ন হিসাব!

বিক্রয়লব্ধ অর্থ, বিজ্ঞাপনের আয়—এ সকল জটিলতার বালাই নেই, শুধু মূলধনের নিকাশ! একটু রহস্য করবার ইচ্ছা হ'ল। ফিরে দাঁড়িয়ে বললাম, "আড়াই হাজার টাকা কি ক'রে তুমি জানালে? বিচিত্রা-নিকেতনের ক্যাশবাবুর সঙ্গে আত্মীয়তা আছে বুঝি ?"

একটু সবজান্তা মুরুব্বিয়ানা চালে দোকানদার বললে, "আমাদের সঙ্গে কারবার, আমরা আর জানি নে ?"

বললাম, "কিন্তু আমি যদি বলি, এরই মধ্যে তাদের দশ হাজার টাকা খরচ হয়ে গেছে, তা হ'লে ?"

আগন্তুকের প্রতি দৃষ্টিপাত ক'রে অল্প একটু হেসে দোকানদার বললে, "হুঁ! দশ হাজার টাকা! কি যে বলেন আপনি!"

"কিন্তু আমার সঙ্গেও যে ওদের কারবার আছে।"

"কি কারবার ?"

"আমি ওখানে সম্পাদকি করি।"

"আপনি 'বিচিত্রা'র সম্পাদক ?"

"সেই রকমই তো জানি।"

বক্রকটাক্ষে 'বিচিত্রা'র কভারের উপর ত্বরিত দৃষ্টিপাত ক'রে দোকানদার বললে, "সম্পাদক তো উপেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায়।"

বললাম, "আমার উপেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায় হবার পক্ষে কোনো আপত্তি আছে কি ?"

কূট প্রশ্ন! 'আছে' বললে বিপদে পড়বার আশঙ্কা, 'নেই' বললে বিপদে পড়বার সম্ভাবনা। প্রশ্নটাকে এড়িয়ে যাবার উদ্দেশ্যে দোকানদার বললে, "আপনাকে তো আপিসে দেখতে পাই নে ?"

বললাম, "তার কারণ, তোমার করবার আমার সঙ্গে নয়, তোমার কারবার বিক্রয়বাবুর সঙ্গে। তা ছাড়া, এই তো কদিন মাত্র কাগজ বেরিয়েছে, এর মধ্যে কবারই বা 'বিচিত্রা' আপিসে গেছ যে, আমাকে দেখতে পাবেই। এবার যেদিন যাবে, সম্পাদকের ঘর জিজ্ঞাসা ক'রে নিয়ে উঁকি মেরো, দেখতে পাবে। এখনো কি বলতে চাও, কারবার শুধু তোমার সঙ্গেই আছ আর ভাদ্র মাসে কাগজ বেরোবে না ?"

দোকানদার বোধ হয় এ কথার কোনো উত্তর খুঁজে পেলে না। চুপ ক'রে রইল। তার বন্ধু তার প্রতি দৃষ্টিপাত ক'রে ঈষৎ তিরস্কারের সুরে বললে, "এসব কথায় তোমার দরকার কি ?" তার পর আমাকে সম্বোধন ক'বে বললে, "যেতে দিন বাবু, যেতে দিন, ও কিছু জানে না।"

বললাম, "সেইটেই তো গুরুতর অপরাধ। কিছু জানে না, অথচ সবজান্তামি করবে। তা ছাড়া, কত বড় অধর্মের কথা দেখ! হাজার হাজার টাকা ফেলে তারা কারবার করছে, যার কল্যাণ তুমিও দু পয়সা উপায় করছ, আর তার বদলে এত বড় চৌমাথায় দাঁড়িয়ে তাদের বিরুদ্ধেই অপপ্রচার চালিয়েছ! এ কথা জানতে পেরে তারা যদি অনিষ্ট করবার অভিযোগে তোমার বিরুদ্ধে এক দফা ফৌজদারি চালায়, তা হ'লে তো বিশ হাত জলের তলায় পড়বে।"

ঢং ঢং ক'রে ট্রাম অসছিল, প্রস্থানোদ্যত হলাম।

"বাবু!"

পিছন ফিরে দেখি, এক দফা ফৌজদারির নামে দোকানদার ও বন্ধু—উভয়েরই মুখ শুকিয়েছে। বললাম, "কি ?"

"অপরাধ হয়েছে,—মাপ করুন।"

"আচ্ছা, আর যেন এমন অপরাধ না হয়।" ট্রামে এসে দাঁড়িয়ে ছিল, তাড়াতাড়ি গিয়ে উঠে বসলাম।

আমি আসল উপেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায়, অথবা ওদের কথোপকথন শুনে ফেলার সুযোগ নিয়ে এক চাল তামাশা ক'রে গেলাম, সে বিষয়ে ওদের মনে কোনো সংশয় জাগ্রত হয়েছিল কি না বলতে পারি নে; কিন্তু এর পর যখনই ঐ স্থানে এসে দাঁড়িয়েছি, দোকানদার যুবক মুখ ফিরিয়ে দাঁড়িয়েছে। বোধ হয় কোনো দিন 'বিচিত্রা'-আপিসে গিয়ে সম্পাদকের ঘরে উঁকি মেরে থাকবে।

শ্রাবণ সংখ্যার লেখা প্রায় সমস্তই ঠিক হয়ে ছিল। এমন কি, কতক লেখা জ্যৈষ্ঠ মাসের দু-চার দিন বাকি থাকতে ছাপাখানায় পাঠিয়ে দেওয়াও হয়েছে। বাকি লেখা স্থির হয়ে যাওয়ার পর আমি একদিন হাওড়া স্টেশনে উপস্থিত হয়ে ভাগলপুরের টিকিট কেটে ট্রেনে চেপে বসলাম। একটা ছোটখাটো ভ্রমণ-প্রস্তাব ( Tour-programme ) ঠিক ক'রে নিয়ে চলেছি। প্রস্তাবের প্রথম স্থান ভাগলপুরে। আমার ভ্রমণ-প্রস্তাবের পরিক্রম-রেখা কতকটা এই ধরনের ছিল—কলিকাতা-ভাগলপুর-পাটনা-মজঃফরপুর-ছাপরা-কাশী-গয়া-মুঙ্গের-ভাগলপুর-কলিকাতা। সঙ্গে কয়েক খণ্ড 'বিচিত্রা'ও নিয়েছি বিতরণের এবং নমুনার জন্য।

পরিক্রমের প্রকৃত উদ্দেশ্য বিহারের কয়েকটি বাঙালী-প্রধান শহরে উপস্থিত হয়ে তথাকার সাধারণ ও উচ্চশ্রেণীর পাঠক-সম্প্রদায়ের মধ্যে 'বিচিত্রা' কি ভাবে গৃহীত হয়েছে তা উপলব্ধি করা। আমরা বহুদিন হতে বিহারের অধিবাসী ; উপরের যে শহরগুলির উল্লেখ করেছি, সেগুলিতে আমাদের আত্মীয়স্বজন বন্ধুবান্ধবের সংখ্যা যথেষ্ট, সুতরাং 'বিচিত্রা' সম্বন্ধে ঐ শহরগুলির বাঙালী সম্প্রদায়ের যথার্থ অভিমত সহজেই সংগ্রহ করতে পারা যাবে। তা ছাড়া, আমার ব্যক্তিগত উপস্থিতির সাহায্যে ঐ সকল স্থানে 'বিচিত্রা'র জনপ্রিয়তা যথাসম্ভব বর্ধিত করা এবং প্রচারকার্য সামান্য কিছু চালানোও উদ্দেশ্যের, মুখ্য না হোক, গৌণ অংশ ছিল।

শয্যার উপর সমগ্র দেহটাকে আনন্দ ও আরামের স্বচ্ছন্দ বিস্তারে ছড়িয়ে দিয়ে গতিশীল ট্রেনের মৃদুমন্দ দোল খেতে খেতে অগ্রপশ্চাৎ নানা কথার চিন্তায় নিমগ্ন হয়ে ভাগলপুরের পথে এগিয়ে চলেছিলাম। চিন্তা,

কিন্তু দুশ্চিন্তা নয়। কলিকাতায় দেখে এসেছি আশাতীত সাফল্য, সম্মুখে যে প্রত্যাশা অপেক্ষা করছে, তারও চতুর্দিক স্বর্ণরেখায় মণ্ডিত। একটা সুমিষ্ট তৃপ্তির তরল আনন্দে সমস্ত অন্তর নিষিক্ত বোধ করছিলাম।

কিন্তু কে তখন জানত, এমন এক নিরতিশয় বেদনাদায়ক সংঘাত আসন্ন হয়ে উঠেছে, যার ফলে আমার ভ্রমণ-প্রস্তাব অর্ধ-সমাপ্ত রেখে দুশ্চিন্তাগ্রস্ত হৃদয় নিয়ে তাড়াতাড়ি কলিকাতায় ফিরতে হবে? হয়তো আমার কলিকাতায় অবস্থানকালেই বহ্নিমান হবার পূর্বে যে অবস্থা ধূমায়িত হচ্ছিল, তার কোনো আভাস পূর্বে পাই নি। তা যদি পেতাম, আমার পরিক্রম-রেখার উপর একটি পাও অর্পণ করতাম না।

প্রত্যুষে ভাগলপুর পৌঁছে 'বিচিত্রা' কাহিনীর বিস্তারিত বিবরণের দ্বারা চা ও খাবারের মজলিস সরগরম ক'রে তুললাম। আষাঢ় মাসের 'বিচিত্রা' অবশ্য এ মজলিসে নূতন জিনিস নয়, প্রকাশিত হওয়া মাত্র এক কপি পাঠিয়ে দিয়েছিলাম কয়েকজন বন্ধু-বান্ধবকেও।

যে ভদ্রমহিলা নিজের ব্যক্তিগত রিক্ততা-তিক্ততাকে গৌণ স্থান দিয়ে একান্ত নিষ্ঠার সহিত আমার পুত্রকন্যাগণের রক্ষণাবেক্ষণের কার্যে নিযুক্ত আছেন, তাঁকে ধন্যবাদ দিলাম। আশ্বাসও দিলাম, লক্ষণ যেরূপ উৎসাহোদ্দীপক, সম্ভবত খুব বেশিদিন দূরবর্তিনী হয়ে থাকতে হবে না। তবে যে পক্ষী দুই শত পঁয়ষট্টি মাইল দূরবর্তী একটি নূতন গাছের শাখায় উড়ে গিয়ে নীড় রচনায় চেষ্টিত হয়েছে, তার নীড় বাঁধা বেশ খানিকটা কায়েম হবার পূর্বে পুরাতন নীড় আগলে থাকাই পক্ষিনীর পক্ষে সমীচীন—সে উপদেশ দিতেও ভুললাম না।

সকালেই বন্ধু-মহলে খানিকটা ঘুরে এলাম। যাঁরা 'বিচিত্রা' পেয়েছিলেন অথবা দেখেছিলেন, তাঁদের প্রশংসাবাণীর দ্বারা শ্রবণ এবং মন উভয়ই পরিপূর্ণ হ'ল।

মধ্যাহ্নে আহারান্তে একটু বিশ্রামের পর আদালতের অভিমুখে রওয়ানা হলাম। উভয় পার্শ্বে সুদীর্ঘ বিটপীনিবদ্ধ ছায়াশীতল ক্লাইভল্যাণ্ড রোড দিয়ে যেতে যেতে মনের মধ্যে একটা অভূতপূর্ব চেতনা উপলব্ধি করতে লাগলাম। বহুদিন এই পথে গতায়তি করেছি ব্যবহারজীবীরূপে, আজ চলেছি সাহিত্যজীবী হয়ে। চোগা-চাপকান-প্যাণ্টের পরিবর্তে আজ পরিধানে ধুতি-পাঞ্জাবি। হাতে আরজি-বিয়ান-তহরির-এজাহার সমন্বিত ব্রীফের পরিবর্তে কাগজে মোড়া একখণ্ড 'বিচিত্রা'। এ যেন চলেছি মথুরার পথ ধ'রে বৃন্দাবনের পথে। এ পথের প্রত্যেকটি তরু-পাপদ লতা-গুল্ম আমার পরিচিত। বায়ু-হিল্লোলিত হয়ে তারা যেন আমাকে অভিবাদন করতে করতে বলছে—বন্ধু, এই হয়তো শেষ দেখা। আর কোনোদিন তুমি হয়তো এ পথে পদার্পণ করবে না। নূতন পথ তোমাকে জয়যুক্ত করুক।

আমার অন্তরের অন্তরতম প্রদেশ হতে কে যেন বলতে লাগল, নববর্ষার সুবৃষ্টিধারায় স্নাত হয়ে তোমরা সজীব হও, পুষ্পিত হও। আকাশের জল-বায়ু-আলোক তোমাদের মঙ্গল করুক।

বার-লাইব্রেরি কক্ষে প্রবেশ করতেই একটা সশব্দ অভ্যর্থনার দ্বারা অভিনন্দিত হলাম। আমার পেশাবিগর্হিত বেশ দেখে সকলেই বুঝতে পারলে, ফিরে না আসবার সপক্ষে সেটা যথেষ্ট নোটিশ। অন্তর না বদলালে কেউ ভেকও বদলায় না, ভোলও ফেরায় না। তবু যেটুকু সন্দেহ ছিল, মোড়ক খুলে 'বিচিত্রা'খানা টেবিলে স্থাপন করতেই তা নিঃশেষে অপসৃত হ'ল। অমন সবল এবং স্পষ্ট লক্ষণ দেখতে পাওয়ার পর প্রকৃত অবস্থা হৃদয়ঙ্গম করতে বিলম্ব হয় না। সকলেই যে কথা বলতে লাগল তার সারমর্ম হচ্ছে, নোনা জল ছেড়ে মিষ্টি জলের মাছ এবার মিষ্টি জলে ফিরে গেছে। কিন্তু মানুষের প্রকৃতি এমনই অদ্ভুত জিনিস, মিষ্টি

জলে ফিরে যাওয়ার জন্যে কয়েকজন মুরুব্বি-শ্রেণীর উকিল আমাকে যখন অভিনন্দিত করছিলেন, তখন এদিক-ওদিক দৃষ্টিপাত ক'রে নোনা জলের জন্যে আমার মনের একটা দিক 'হায় হায়' করছিল। এই নোনা জলে দীর্ঘ বারো বৎসর সন্তরণ দিয়েছি, সে কি এত শীঘ্র ভোলা যায়?

'বিচিত্রা'খানা হাতে হাতে টেবিলের চতুর্দিকে ঘুরতে ঘুরতে প্রশংসা অর্জন করতে লাগল। যারা মর্ম বুঝলে না, তারা রূপ দেখে মুগ্ধ হ'ল। যারা রূপও দেখলে মর্মও বুঝলে, তাদের অধিকাংশ লোক ভি.পি. করবার অনুরোধ জানিয়ে নাম লেখাতে লাগল।

এসেছিলাম রথ দেখতে, কিন্তু কলা-বেচার কলে দৈব এমন সজোরে দম লাগিয়ে দিলে যে, পাটনা হয়ে মজঃফরপুরে পৌঁছবার দিন তিনেক পরে খতিয়ে দেখি, ভাগলপুর পাটনা ও মজঃফরপুর এই তিনটি শহরের অযাচিত নূতন গ্রাহকের সংখ্যা এক শত অতিক্রম ক'রে গেছে। এ একশো গ্রাহকের এক শোটিকেই স্বয়মাগত বলা যেতে পারে। আমার উপস্থিতি পরোক্ষভাবে কিছু কাজ হয়তো করেছিল, কিন্তু আমি নিজে একটি লোককেও গ্রাহক হবার জন্য অনুরোধ করি নি।

গ্রাহক হবার এই স্বতঃস্ফূর্ত আগ্রহ দেখে উল্লসিত হলাম। আশা হ'ল, দৈবের কলে দম যদি না ফুরোয়, আমার ভ্রমণ-প্রস্তাব শেষ হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে অন্তত শ তিনেক নূতন গ্রাহক লাভ করার কৃতিত্ব দাবি করতে পারব। কিন্তু সহসা একদিন অনাশঙ্কিতভাবে দম ফুরোল। বোধ করি, একই ডাকে কলিকাতা থেকে একসঙ্গে দুখানি চিঠি পেলাম, যে চিঠি দুটির মধ্যে বিরোধের তীব্র অভিযোগ বর্তমান। অবিলম্বে কলিকাতা প্রত্যাবর্তনের জন্য দুখানি চিঠিতেই আমার প্রতি সনির্বন্ধ অনুরোধ। একটি চিঠি যতিনাথের, অপরটি সতীশ ঘটকের। পরিচালনা সংক্রান্ত কোনো বিষয় নিয়ে মতান্তর দেখা দিয়েছে, কিন্তু মতান্তরের

পাশে পাশে মনান্তরের উষ্ণ হল্‌কা। আশঙ্কা হ'ল, 'বিচিত্রা'র ভাগ্য-আকাশের বায়ুকোণে ঝটিকার মেঘসঞ্চার হয়েছে।

সেই দিনই তল্পি-তল্পা বেঁধে কলিকাতা রওয়ানা হলাম। মাত্র কয়েকদিন পূর্বে যে পথে আশার সুখস্বপ্ন দেখতে দেখতে এসেছিলাম, প্রত্যাবর্তনকালে সেই পথ দুশ্চিন্তায় নিদ্রাহীন হয়ে উঠল।

পরদিন কলিকাতায় পৌঁছেই উভয় পক্ষের মনান্তর অপনীত ক'রে পূর্ণাবস্থা ফিরিয়ে আনবার কার্যে আত্মনিয়োগ করলাম। কিন্তু আমার এবং কান্তিবাবুর মিলিত চেষ্টা নিষ্ফল হ'ল, 'বিচিত্রা'র সহিত যতিনাথ এবং অমলবাবুর যোগ ছিন্ন হয়ে গেল।

এই বিপর্যয়ে অভিভূত হয়ে পড়লাম। 'বিচিত্রা' পরিচালনায় যতিনাথ এবং অমলবাবু উভয়ের সহায়তাই বিশেষ মূল্যবান ছিল; অমলবাবুর তো কথাই নেই। প্রবন্ধ ও চিত্র সংগ্রহ, বিজ্ঞাপনের ব্যবস্থা, মুদ্রণকার্য সকল বিষয়েই তাঁর দক্ষতা লোভনীয় বস্তু ছিল।

সঙ্কট দেখা দিলে।

কিন্তু সঙ্কটের সঙ্গে সঙ্গে সঙ্কটকে অতিক্রম করবার একটা দুর্বার শক্তিও মনের মধ্যে দেখা দিতে আরম্ভ করলে। সেই শক্তিকে সর্বতোভাবে সংহত ক'রে নিয়ে 'বিচিত্রা'-পরিচালনার কার্যে মনপ্রাণ নিযুক্ত করলাম।

'বিচিত্রা'র প্রথম সংখ্যার রঙিন প্রচ্ছদ সুপ্রসিদ্ধ চিত্রশিল্পী শ্রীযুক্ত চারু রায় অঙ্কিত করেছিলেন। প্রচ্ছদটি অলঙ্কার-শিল্পের একটি মনোরম নিদর্শনরূপে সকল শ্রেণীর নিকট হতে প্রচুর প্রশংসা অর্জন করেছিল। 'বিচিত্রা'র নামের সহিত সঙ্গতি রক্ষা ক'রে শিল্পী চিত্র-পরিকল্পনার মধ্যে বিচিত্র রঙ এবং রূপের সমাবেশ করেছিলেন।

পরবর্তী প্রচ্ছদ খ্যাতনামা চিত্রকর শ্রীযুক্ত যতীন্দ্রকুমার সেনকে দিয়ে প্রস্তুত করাবার প্রস্তাব উঠল। একটি মোটা অঙ্কের দক্ষিণার প্রতিশ্রুতি দিয়ে অমলবাবু যতীন্দ্রবাবুকে উক্ত কার্যে ব্রতী করিয়ে এলেন। কার্য প্রায় শেষ হয়ে এসেছে এমন সময়ে একদিন অমলবাবু আমাকে নিয়ে ১৪ নং পার্শিবাগান লেনে উপস্থিত হলেন।

পার্শিবাগান লেনের ১৪ নং নম্বর বাড়ি পার্শিবাগানের সুবিখ্যাত বসু-বংশের গৃহ। প্রখ্যাত সাহিত্যিক, কথাশিল্পী ও অভিধানকার শ্রীযুক্ত রাজশেখর বসু এবং জগৎবিখ্যাত মনোবিজ্ঞানবিদ্ ও মনোবিকারের সুদক্ষ চিকিৎসক শ্রীযুক্ত গিরীন্দ্রশেখর বসু এই বংশের সন্তান। যে সময়ের কথা বলছি, তখন রাজশেখরবাবু বেঙ্গল কেমিক্যাল অ্যাণ্ড ফার্মাসিউটিক্যাল ওয়ার্কসের কারখানায় তাঁর খাস কোয়ার্টার্সে বাস করতেন। শনি-রবিবারে তিনি বাড়ি আসতেন এবং সময়ে সময়ে এক-আধ দিন তথায় অবস্থানও করতেন। গিরীন্দ্রশেখর, কৃষ্ণশেখর প্রভৃতি অন্যান্য ভাই পার্শিবাগানের গৃহে বাস করতেন।

১৪ নং পার্শিবাগানে আমরা উপস্থিত হলাম; তার কারণ ঐখানেই শিল্পী যতীন্দ্রকুমারের সাক্ষাৎ পাওয়া সহজ ছিল। দিবসের অনেকখানি

সময়েই তিনি ঐ গৃহে যাপন করতেন, এবং আমার বিশ্বাস, ছবি আঁকার অনেক কিছু কাজকর্মও ঐ গৃহেই চালাতেন। তা ছাড়া আর একটি যৎপরোনাস্তি মনোজ্ঞ ব্যাপারও চালাতেন—আড্ডা জমাতেন।

আড্ডা দেওয়াকে চিরদিন জীবনের একটা সুমিষ্ট বিলাস ব'লে বিবেচনা ক'রে এসেছি; জাত আড্ডাবাজ আমি, গন্ধের দ্বারা আড্ডার অস্তিত্ব টের পাই। চোদ্দ নম্বর একটি যে সরেস দরের আড্ডাপীঠ, তা সেখানে প্রবেশ মাত্রই বুঝতে পারলাম। বেশি দিন সেখানে যাবার সৌভাগ্য হয় নি, বোধ হয় দিন তিনেকের বেশি হবে না; কিন্তু তাইতেই মালুম হয়ে গিয়েছিল। মূর্তি যে দেখাতে জানে, সে দ্বিতীয় দিনের অপেক্ষা রাখে না, প্রথম দিনেই দেখিয়ে দেয়। চোদ্দ নম্বরের আড্ডা-পীঠ মামুলি আড্ডার পীঠ নয়। তার আবহাওয়া সাহিত্যের সৌরকরের দ্বারা উদ্ভাসিত, শিল্পের বায়ুপ্রবাহের দ্বারা হিল্লোলিত। রাজশেখরবাবুর কৌতুকরস-সরস সাহিত্য এবং যতীন্দ্রকুমারের সেই সাহিত্যের অপরূপ রেখানুবর্তন এই আড্ডার রাগ ও ছন্দ।

বসু-পরিবারের সহিত, বিশেষত রাজশেখর বসুর সহিত, যতীন্দ্র-কুমারের বন্ধুত্ব যেমন সুদৃঢ় তেমনি সুচিরস্থায়ী। রাজশেখরবাবু গল্প রচনা করতেন, যতীন্দ্রবাবু সযত্নে ছবি এঁকে এঁকে সেই গল্পকে চিত্রিত করতেন। বোধ করি, এই কথা ও চিত্রের জড়াজড়ির প্রভাবেই তাঁদের মনের জড়াজড়িও এতটা দৃঢ় হতে পেরেছে। বহুদিন হতে রাজশেখরবাবু ভবানীপুরে বকুলবাগান রোডে গৃহ নির্মিত ক'রে বাস করছেন, যতীন্দ্রবাবু বাস করেন সুদূর বেলগাছিয়া অঞ্চলে; কিন্তু এ দীর্ঘ ব্যবধান এ পর্যন্ত উভয়কে শুধু মনেই নয়, দেহেও বিচ্ছিন্ন করতে পারে নি,—এখনও প্রত্যহ উভয়ের দেখা হয়।

গত ৫-৪-১৯৫২ তারিখে বহুদিন পরে শ্রীযুক্ত রাজশেখরবাবুর সহিত

দেখা করতে গিয়েছিলাম। তখন অপরাহ্ণকাল, বেলা সাড়ে চারটার কাছাকাছি হবে। সঙ্গে ছিল আমার কনিষ্ঠ পুত্র কমলকুমার। গেট পেরিয়ে উভয়ে বারান্দায় উঠে দেখি, এক প্রান্তে শয়ন ক'রে একটি বালক-ভৃত্য সুখে নিদ্রা দিচ্ছে। তার নাসিকাধ্বনির নিয়ন্ত্রিত উত্থান-পতন লক্ষ্য ক'রে বুঝলাম, নিদ্রা তখনও প্রগাঢ়। ঘুম ভাঙাতে মায়া হ'ল, কিন্তু উপায়ও তো নেই। ক্ষণকাল ডাকাডাকির পর জাগ্রত হয়ে সে জিজ্ঞাসা করলে, "কি চান ?"

বললাম, "বাবু আছেন ?"

"আছেন।"

"কোথায় ?"

"ওপরে।"

বললাম, "তাঁকে খবর দাও। বল, উপেনবাবু এসেছেন।"

বৈঠকখানা-ঘরে আমাদিগকে বসতে ব'লে ভৃত্য দ্বিতলে খবর দিতে গেল।

বাইরের উজ্জ্বল আলোকধারা থেকে দোর-জানলা-বন্ধ-করা স্তিমিতালোক কক্ষে প্রবেশ ক'রে প্রথমটা সব জিনিস স্পষ্ট ঠাহর হচ্ছিল না। তথাপি বুঝতে পারলাম, প্রশস্ত ফরাশের, উপর এক ভদ্রলোক শয়ন ক'রে ছিলেন। আমাদের দুজনকে দেখে ধীরে ধীরে উঠে বসলেন। পা ঝুলিয়ে ফরাশের ধারে উপবেশন করলাম। বাধ্য হলাম ভদ্রলোককে পিছন দিকে রাখতে।

পর-মুহূর্তেই পিছন দিক থেকে প্রশ্ন এল, "উপেনবাবু না ?"

তাড়াতাড়ি জুতা খুলে সামনে হয়ে ফরাশের উপর উঠে ব'সে বললাম, "আজ্ঞে হ্যাঁ, আমি উপেন।"

"আমাকে চিনতে পারলেন না ?"

অপ্রতিভ হয়ে বললাম, "আলো থেকে অন্ধকারে এসেছি, ঠিক বুঝতে পারছি নে। তা ছাড়া, দৃষ্টিও ক্ষীণ।"

ভদ্রলোক বললেন, "আমি যতীন।"

উল্লসিত হয়ে উঠলাম। রামের সঙ্গে দেখা করতে এসে লক্ষ্মণেরও দেখা পাওয়া গেল! এই অপ্রত্যাশিত সৌভাগ্যের জন্য আনন্দ প্রকাশ ক'রে বললাম, "কিন্তু আপনি আমাকে এত সহজে চিনলেন কেমন ক'রে যতীনবাবু? বহুদিন তো আপনি আমাকে দেখেন নি?"

যতীনবাবু বললেন, "কয়েকদিন আগে খবরের কাগজে আপনার ছবি দেখেছি। তার পর দেখি অনেকটা সেই ছবির মূর্তি ধারণ ক'রে একটি ভদ্রলোক ঘরে ঢুকছেন। তখন মনে মনে সিদ্ধান্ত করলাম, এ আপনি ছাড়া আর কেউ নয়।"

আমরা যে চক্ষে ছবি দেখি, তাতে ভুলতে বিশেষ বিলম্ব হয় না। চিত্রকরদের চক্ষে কিন্তু ছবি বাঁধা পড়ে এমন বন্ধনে, যা থেকে মুক্তিলাভ করা সহজ নয়।

গেঞ্জি গায়ে রাজশেখরবাবুর বৈঠকখানায় যতীন্দ্রবাবু দিব্য আরামে নিদ্রা দিচ্ছিলেন দেখে মনে হ'ল, কাছাকাছি কোথাও তিনি বাস করেন। ভাবখানা এমনই যে, ঐ বাড়িতেই বাস করেন শুনলেও বোধ হয় খুব বেশি বিস্মিত হবার কারণ হ'ত না। কৌতূহলের বশবর্তী হয়ে জিজ্ঞাসা করলাম, "কোথায় থাকেন যতীনবাবু? কাছাকাছিই বোধ হয়?"

হাসিমুখে যতীনবাবু বললেন, "আজ্ঞে না, আমি থাকি বেলগাছিয়া অঞ্চলে। প্রত্যহ বেলা বারোটা সাড়ে বারোটার সময়ে এখানে আসি; সন্ধ্যার সময়ে ফিরে যাই।"

বললাম, "এতখানি আসতে নিশ্চয়ই কষ্ট হয় খুব?"

মৃদু হেসে যতীনবাবু বললেন, "তা একটু হয়, সেইজন্যে খানিকক্ষণ বিশ্রাম ক'রে নিই।"

একটি সংস্কৃত শ্লোকে পড়েছিলাম—আকাশে মেঘ থাকে, পৃথিবীতে ময়ূর; লক্ষ যোজন দূরে ভানু থাকে, সরোবরে পদ্ম বহু যোজন দূরবর্তী হয়েও ইন্দু কুমুদের বন্ধু; সুতরাং 'যো যস্য হৃদ্যো ন হি তস্য দূরঃ,'—যে যার হৃদ্য, সে তার থেকে দূর নয়। এ কথা সত্য, তা স্বীকার করি। কিন্তু এ কথাও অস্বীকার করতে পারি নে যে, লক্ষ যোজন দূরে নিজের কক্ষে কায়েম থেকে পদ্মের দল বিকশিত ক'রে সূর্য হৃদ্যতার যে-পরিমাণ পরিচয় দেন, গাড়ি-ঘোড়া-লরি-মোটর-সমাকীর্ণ কলিকাতার মাইল আষ্টেক বিপদসঙ্কুল পথ ট্রামে-বাসে অতিক্রম ক'রে প্রত্যহ বন্ধুগৃহে উপস্থিত হয়ে যতীনবাবু তার চেয়ে কিছু বেশি পরিমাণের পরিচয়ই দিয়ে থাকেন।

এই দুটি প্রথম শ্রেণীর কথাশিল্পী ও চিত্রশিল্পীর পরস্পরের প্রতি হৃদ্যতার অপূর্ব কাহিনী লিপিবদ্ধ ক'রে আমার 'স্মৃতিকথা'র একটি পাতা স্নিগ্ধ ক'রে রাখলাম।

রাজশেখরবাবু উপর থেকে নীচে এসে বসতেই আমাদের তিনজনের বৈঠক জ'মে উঠল। রাজশেখরবাবু মিতভাষী, মৃদুভাষী, কথা বলেন অল্প, কথায় কথায় উচ্চৈঃস্বরে হেসে ওঠেন না, শোনেন বেশি বলেন কম, কিন্তু যেটুকু বলেন তার আন্তরিকতা এবং অভিনবত্বের গুণে কথোপকথন সরস হয়ে ওঠে। যেমন হয়ে থাকে, নানা বিষয় আশ্রয় ক'রে আমাদের কথা অগ্রসর হয়ে চলল।

কিন্তু স্মৃতিকথার সীমান্তরেখা অতিক্রম ক'রে আমি অতর্কিতে হালের কথা বলতে আরম্ভ করেছি। সুতরাং যে কথা বলতে আরম্ভ করেছিলাম, তাইতে ফিরে যাই।

অমলবাবুর সঙ্গে প্রথম যেদিন ১৪ নং পার্শিবাগান লেনে যাই, সেদিন

তথায় কয়েক ব্যক্তিই উপস্থিত ছিলেন। দুজন ভিন্ন আর কারো নাম মনে পড়ে না—এক শিল্পী যতীন্দ্রকুমার, অপর শ্রীযুক্ত নরেন্দ্রনাথ বসু। 'বাঁশরী' পত্রের সম্পাদক সাহিত্যিক নরেন্দ্রনাথের সহিত অমলবাবু আমার পরিচয় করিয়ে দিলেন। সেদিন যে পরিচয়ের সূত্রপাত, কাল-ক্রমে তা উত্তরোত্তর বর্ধিত হওয়ার ফলে আজ নরেন্দ্রনাথ আমার অনুজ সমান হয়ে দাঁড়িয়েছেন।

১৯২৮ সালের জুলাই মাসে 'উৎকেন্দ্র সমিতি'র দ্বাত্রিংশ বার্ষিক উৎসব উপলক্ষে রামমোহন লাইব্রেরি হলে রাজশেখরের 'চিকিৎসা-সঙ্কট' কৌতুক-নাট্য অভিনীত হয়। যতদূর মনে পড়ে, সে সময়ে উক্ত নাট্যের মহলা এবং অন্যান্য তোড়জোড় চলছিল। আমি ও অমলবাবু যেদিন গিয়েছিলাম, সেদিন বোধ হয় ঐ বিষয়েই আলোচনা চলছিল। অভি-নয়ের পরিচালনা ব্যাপারে যতীন্দ্রকুমার ছিলেন কর্ণধার। প্রহসনে ধনাঢ্য যুবক নন্দদুলাল মিত্রের প্রধান ভূমিকা গ্রহণ করেছিলেন নরেন্দ্র-নাথ বসু। অভিনয়-দিবসে অভিনয় দেখবার জন্য আমি নিমন্ত্রিত হয়েছিলাম। অভিনয় সর্বাঙ্গসুন্দর হয়েছিল এবং প্রধান চরিত্রের ভূমিকায় নরেন্দ্রনাথের অভিনয় হয়েছিল অনবদ্য। দীর্ঘ চতুর্বিংশ বৎসরের কথা হ'ল, কিন্তু সেদিন ঘণ্টা দেড়েক-দুই যে অপরূপ আনন্দ উপভোগ করে-ছিলাম, তার স্মৃতির সৌরভ এখনও মনের মধ্যে বর্তমান আছে। ইংরেজীতে যাকে বলে 'team work', বাংলায় যার প্রতিশব্দ করা যেতে পারে দল-নির্বহন, অভিনয়ের সর্বত্র পরিপূর্ণভাবে তার অস্তিত্ব দেখা গিয়েছিল। কঠোর কর্ণধার যতীন্দ্রকুমারের দয়া-মমতাবর্জিত নিরবসর মহলাকার্য পরিচালনার ফলেই তা হতে পেরেছিল।

'বিচিত্রা'র প্রচ্ছদ অঙ্কনের কার্য প্রায় শেষ হয়ে এসেছে। আমাদের দৃষ্টির সামনে যতীন্দ্রকুমার যখন সেটি মেলে ধরলেন, রঙ ও রেখার বিচিত্র

লীলা দেখে আমাদের চক্ষু উৎফুল্ল হয়ে উঠল। আশ্বিন মাস থেকে 'বিচিত্রা'য় সেই প্রচ্ছদটি প্রকাশিত হতে আরম্ভ করেছিল। বাংলা মাসিকের প্রচ্ছদের ইতিহাসে 'বিচিত্রা'র সেই অপরূপ প্রচ্ছদটি একটি আদর্শ ( classic ) হয়ে আছে। আজ পর্যন্ত বোধ করি সে প্রচ্ছদটি অপরাজিত।

যতীন্দ্রকুমারের চিত্র-প্রতিভার উপর রবীন্দ্রনাথের বিশেষ আস্থা ছিল। ঘটনাক্রমে আমরা একদিন সে কথা জানতে পারি। রবীন্দ্র-নাথের উপন্যাস চিত্রিত ক'রে 'বিচিত্রা'য় প্রকাশিত করবার উচ্চাভিলাষ হঠাৎ একদিন আমাদের পেয়ে বসল। বাংলা দেশে এবং বাংলা সাহিত্যে তা হ'লে একটা অভূতপূর্ব কাণ্ড দেখানো যেতে পারে। কথাটা একদিন সাহস ক'রে আমরা রবীন্দ্রনাথের কাছে উত্থাপিত করলাম। প্রস্তাব শুনে কবি ক্ষণকাল চিন্তাগ্রস্ত হয়ে রইলেন, তার পর বললেন, "যতীন যদি এ কাজের ভার গ্রহণ করে, তা হ'লে আমি সম্মত আর নিশ্চিন্ত হতে পারি।"

আশাতীত সাফল্যে উৎফুল্ল হয়ে আমরা কথাটা যতীন্দ্রবাবুকে জানালাম। রবীন্দ্রনাথের কথা শুনে যতীন্দ্রকুমার কিন্তু শিউরে উঠে বললেন, "বাপ রে! এত বড় বিশ্বাসকে আমি কখনো বিপন্ন হবার উপায় ক'রে দিতে পারি! ও-কার্য আমার দ্বারা হবে না।"

অবশেষে একদিন রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে যতীন্দ্রকুমারের সাক্ষাৎকার ঘটানো হ'ল। যতীন্দ্রকুমার বললেন, তিনি ছবি আঁকতে একমাত্র এই শর্তে সম্মত হতে পারেন যে, কবির সঙ্গে পরামর্শ ক'রে পরিবর্তিত করতে করতে ছবিগুলি যখন রবীন্দ্রনাথের সম্পূর্ণ মনের মতো হবে, তখনই শুধু সেগুলি প্রকাশিত করা চলবে; অন্যথা প্রকাশ করা চলবে না।

এ কথায় রবীন্দ্রনাথ সম্মত হলেন না। তিনি বললেন, তিনি শুধু

শিল্পীই মনোনীত করতে পারেন; চিত্র মনোনয়নের কার্যে চিত্রকরের অধিকার নিরঙ্কুশ।

অগত্যা হতাশ হতে হ'ল। আমাদের অভিলাষ সফল হতে পারল না।

## ১৮

মাসে মাসে ধারাবাহিকভাবে 'বিচিত্রা'য় রবীন্দ্রনাথের 'যোগাযোগ' উপন্যাস প্রকাশিত হচ্ছে। এ বিষয়ে ব্যতিক্রম তো দূরের কথা, অসুবিধাও কিছুমাত্র ছিল না। কলের মত নিয়মিতভাবে রবীন্দ্রনাথের কাছ থেকে পাণ্ডুলিপি আসছে; লেখা কম্পোজ হয়ে সঙ্গে সঙ্গে প্রুফ চ'লে যাচ্ছে জোড়াসাঁকোয় অথবা শান্তিনিকেতনে, অর্থাৎ যেখানে রবীন্দ্রনাথ আছেন তথায়; অবিলম্বে সংশোধিত হয়ে প্রুফ ফিরে আসছে আমাদের হাতে; এবং সঙ্গে সঙ্গে ফর্মার ভিতর ছাপা হয়ে যাচ্ছে।

লেখা দেবার কথা দিয়ে প্রতিশ্রুতি রাখনেওয়ালা আমার অভিজ্ঞতায় রবীন্দ্রনাথের সমকক্ষ বাংলা দেশে আর কেউ ছিল না। কথা দিয়েছেন বুধবার অপরাহ্ণ চারটার সময়ে উপস্থিত হয়ে লেখা নিয়ে যাবার। বুধবার বেলা চারটার সময়ে হাজির হয়ে দেখি, লেখা প্রস্তুত হয়ে টেবিলের ওপর অপেক্ষা করছে, রবীন্দ্রনাথ কার্যান্তরে ব্যাপৃত হয়েছেন। বুধবার কখনো বৃহস্পতিবারে ঠেলা মারত না।

এ বিষয়ে শরৎচন্দ্র কিন্তু ছিলেন রবীন্দ্রনাথের ঠিক বিপরীত। বিনা অশ্রুপাতে কখনো তাঁর কাছ থেকে লেখা আদায় করা যেত না। বুধবারের প্রতিশ্রুতি বুধবারে তো কদাচ রক্ষিত হ'ত না, ঠেলা মারতে মারতে এক চক্র দিয়ে আর এক বুধবারে উপনীত হ'লে সৌভাগ্য ব'লে বিবেচনা করা যেত।

শুনতে পাই, সম্পাদক জলধর সেন মহাশয় 'ভারতবর্ষে'র লেখার জন্যে চিঠি লিখে লিখে, পেয়াদা পাঠিয়ে পাঠিয়ে যখন হার মেনে যেতেন, তখন নিরুপায় হয়ে অতি প্রত্যুষে সশরীরে শরৎচন্দ্রের বাজে-শিবপুরের

গৃহে উপস্থিত হতেন। শরৎচন্দ্রের ভৃত্য ভোলানাথকে হাঁক দিয়ে ডেকে বলতেন, "ওরে ভোলা, চা নিয়ে আয়। আর বাড়ির ভিতর বউমাকে ব'লে দে, আজ আমি এইখানে নাওয়া-খাওয়া করব।" তার পর জামা-গেঞ্জি খুলে রেখে একটা তাকিয়া বুকে দিয়ে শুয়ে প'ড়ে বর্মা চুরুট মুখে খবরের কাগজ টেনে নিয়ে পড়তে আরম্ভ করতেন।

এ-পাশ ও-পাশ ঘুরে বেড়িয়ে বেড়িয়ে মুচকি হাসি হাসতে হাসতে শরৎচন্দ্র জিজ্ঞাসা করতেন, "কি ব্যাপার বলুন তো দাদা? যা কিছু ব্যবস্থা আমাকে বাদ দিয়েই করছেন—কি মতলব আপনার?"

জলধরদাদা বলতেন, "মতলব, বেলা পাঁচটার সময়ে চা খেয়ে বাড়ি ফেরবার, আর সেই সময়ে তোমার লেখাটাও নিয়ে যাবার। সুতরাং এখানে আর সময় নষ্ট না ক'রে ওপরে গিয়ে লিখতে আরম্ভ কর। পাঁচটার মধ্যে লেখা যদি শেষ না হয়, তা হ'লে চাই কি—"

"রাত্তিরটাও থেকে যেতে পারেন?"

ঘাড় নেড়ে জলধরদাদা বলতেন, "তাও হয়তো পারি।"

'বিচিত্রা'য় দীর্ঘকাল ধ'রে শরৎচন্দ্রের দুটি বৃহৎ উপন্যাস 'শ্রীকান্ত চতুর্থ পর্ব' ও 'বিপ্রদাস' প্রকাশিত হয়েছিল; সুতরাং বলা বাহুল্য, সেই দুটি উপন্যাসের লেখা আদায় করবার ব্যাপারে আমাকে বহু অশ্রুপাতই করতে হয়েছিল। আমার সময়ে শরৎচন্দ্র বাজে-শিবপুর থাকতেন না; থাকতেন হয় বাজে-শিবপুরের চেয়ে নিকটে বালিগঞ্জে অশ্বিনী দত্ত রোডে, নয় বাজে-শিবপুরের চেয়ে অনেক দূরে সামতাবেড়ে। শরৎচন্দ্র যখন কলিকাতায় থাকতেন, লেখার জন্য অশ্বিনী দত্ত রোডে আমাকে প্রায় পাড়ি মারতে হ'ত; কিন্তু সামতাবেড় থেকে শরৎচন্দ্রের লেখা নিয়ে আসতেন সামতাবেড়নিবাসী বি. এন. রেলের ডেলিপ্যাসেঞ্জার শ্রীমান তুলসী। তুলসী শিয়ালদহ স্টেশনে রেলে চাকরি করতেন—যেদিন শরৎ তাঁর

হাতে লেখা পাঠাতেন, সন্ধ্যার পর গৃহে প্রত্যাবর্তনকালে 'বিচিত্রা' আপিসে এসে তিনি সে লেখা দিয়ে যেতেন।

শরৎচন্দ্রের লেখা আসবার প্রত্যাশিত সময় একদিন-একদিন ক'রে ক্রমশ বেশি-বেশি উত্তীর্ণ হয়ে যাচ্ছে, এদিকে তুলসীরও কোনো খোঁজ-খবর নেই, উদ্বিগ্ন হয়ে উঠি। বেলা সাড়ে নটা আন্দাজ হাওড়া স্টেশনে উপস্থিত হয়ে যে লোক্যাল ট্রেনে তুলসী আসে, তার অপেক্ষায় প্ল্যাট্‌ফর্মের বাইরে গেট আগলে দাঁড়িয়ে থাকি। পকেটে ক'রে আপিস থেকে লিখে নিয়ে আসি শরতের নামে চিঠি, তার মর্ম এইরূপ—প্রিয় শরৎ, লেখা আসতে আর দেরি হ'লে অপদস্থ হতে হবে। দোহাই তোমার, যে রকম ক'রে পার লেখা শেষ ক'রে কাল তুলসীর হাতে পাঠিও। আমি আবার কাল যথাসময়ে হাওড়া স্টেশনে হাজির থাকব।

তুলসীর হাত থেকে লেখা নেবার জন্য হাওড়া স্টেশনে আমার হাজির থাকবার কিছুই প্রয়োজন ছিল না, আপিসের কোনও কর্মচারীকে পাঠিয়ে দিলেই চলতে পারত। লেখা পাবার জন্যে স্টেশনে আমি নিজে যাতায়াত করছি অবগত হ'লে লেখার বিষয়ে শরৎ একটু বিশেষভাবে তৎপর হবে—এই উদ্দেশ্যেই আমি হাওড়া স্টেশনে যেতাম।

নির্দিষ্ট লোক্যাল ট্রেনটি প্ল্যাট্‌ফর্মে এসে দাঁড়াতে আপিসের বাবুরা পিল্‌পিলিয়ে বেরিয়ে প'ড়ে আপিসে লেট না হবার উৎসাহে ঊর্ধ্বশ্বাসে গেটের দিকে ধাওয়া করতেন। সেই প্রবল ও দুর্মদ জন-সংঘাতের ধাক্কার দ্বারা অকারণ বিপন্ন হবার আশঙ্কায় টিকিট-কালেক্টরে পাশের দিকে স'রে দাঁড়াতাম; এ কথা তাঁরা নিঃসংশয়ে জানতেন, মান্থলি-টিকিটধারী শত শত ডেলি-প্যাসেঞ্জারের ভিড়ে গা ঢাকা দিয়ে দু-চারজন বিনা টিকিটের যাত্রীও অবলীলাক্রমে লৌহ গেট পার হচ্ছেন। কিন্তু তার উপায়ই বা কি আছে? বিবাহ-গৃহে বরযাত্রী-কন্যাযাত্রীর ভিড়ের সঙ্গে

দেহ মিলিয়ে দু-চারজন বিনা নিমন্ত্রণের যাত্রীও তো পুষ্পমাল্যের ছাড়পত্র পেয়ে নির্বিবাদে গৃহদ্বার অতিক্রম করে।

উৎসুক নেত্রে চেয়ে থাকি প্ল্যাটফর্মের দিকে। প্রতিবারই প্রায় বারো আনা লোক নিষ্ক্রান্ত হয়ে যাবার পর দেখা যায়, মন্থর-গতিতে তুলসী আসছে। ছোট মানুষ, কৃশ, খর্ব, দুর্বল দেহ,—বোধ করি, প্রথম দিকের ভিড়ের ধাক্কাধাক্কি এড়াবার জন্য কিছুক্ষণ সে গাড়ি থেকে নামে না। হয়তো বা তাঁর আপিসের তেমন তাড়াহুড়াও থাকে না, অথবা ট্রেনের পিছন দিকের কামরার আরোহী হয়।

গেট পেরিয়ে এসে আমাকে দেখতে পেয়ে সে ব্যস্তভাবে অবনত হয়ে প্রণাম করে। মুখে তার অস্বাস্থ্যজনিত দার্শনিক নির্বিকারের অতি-মৃদু হাসি; দেখে বোঝবার উপায় নেই, সে হাসি ভয়ের অথবা অভয়ের। ভয়ে ভয়ে জিজ্ঞাসা করি, "কি খবর তুলসী? এনেছ?"

স্মিতমুখে তুলসী হয়তো উত্তর দেয়, "আজ্ঞে না, আজ হয়ে উঠল না; কাল নিশ্চয় নিয়ে আসব।"

পকেট থেকে শরৎকে লিখিত চিঠিখানা বার ক'রে তার হাতে দিয়ে বলি, "কাল নিশ্চয় আনা চাই তুলসী, নইলে মান থাকবে না। আপিস থেকে ফিরে গিয়ে তুমি একটু ভাল ক'রে শরৎকে তাড়া দিয়ো। কাল আবার আসব।"

ব্যস্ত হয়ে তুলসী বলে, "আজ্ঞে না, আপনি কষ্ট ক'রে আসবেন না, আমি না-হয় আপিস যাবার পথেই দিয়ে যাব।"

উত্তর দিই, "না, তোমার লেট হয়ে যাবে। আমিই আসব।"

কোনবার হয়তো প্রণাম ক'রে উঠে আমার প্রশ্নের উত্তরে তুলসী বলে, "আজ্ঞে হ্যাঁ, লেখা এনেছি।" মুখে সেই নির্বিকারের স্তিমিত

হাসি, যার প্রকাশ আছে, কিন্তু ব্যঞ্জনা নেই। পকেট থেকে শরৎচন্দ্রের পাণ্ডুলিপি বার ক'রে সে আমার হাতে দেয়।

তুলসীকে ধন্যবাদ দিয়ে আপিসে ফিরে আসি। শরতের লেখা পাঠিয়ে দিই ছাপাখানায়, পকেট থেকে আপাতত অনাবশ্যক চিঠিখানা বার ক'রে ছিঁড়ে ফেলে পাঠাই বাজে কাগজের ডালায়। এক-আধবার এমনও হয়েছে, দেখি, প্ল্যাটফর্মে তুলসীর পার্শ্বে ধীরে ধীরে আসছেন স্বয়ং শ্রীমান বৃক্ষ অর্থাৎ শরৎচন্দ্র—পকেটে বহন ক'রে ঈপ্সিত ফল অর্থাৎ উপন্যাসের পাণ্ডুলিপি।

গেট পেরিয়ে এসে আমাকে একটা প্রণাম ক'রেই তুলসী ছুট দেয় আপিসের অভিমুখে। শরতের মুখে লজ্জা ও কৌতুকের মৃদু-মধুর হাসি—"ভারি কষ্ট দিয়েছি তোমাকে, না ?"

বলি, "তা একটু দিয়েছ, কিন্তু আনন্দও তো দিলে।"

শরৎ বলে, "কি করি বল উপীন, পরশু সকালে ঘুম থেকে উঠে মনে মনে বদ্ধপরিকর হলাম, চা খাওয়া সেরে তোমার লেখা নিয়ে বসতেই হবে। চা খাওয়ার পর যখন কাগজ-কলম নিয়ে বসবার কথা, ঠিক সেই সময়ে হঠাৎ লেগে গেলাম পুরনো বন্দুকের অংশগুলো খুলে পরিষ্কার করবার অকাজে। বন্দুকটা বহুকাল অব্যবহৃত হয়ে প'ড়ে আছে, ভবিষ্যতে শীঘ্র ব্যবহৃত হবার সম্ভাবনা কিছুমাত্র নেই, অথচ বিনা কারণে অথবা প্রয়োজনে সেটাকে সাফ করতে ব'সে পড়লাম। এ তুমি বুঝবে না উপীন, আমার মধ্যে এমন এক বেয়াড়া মানুষ আছে, যে সময়ে সময়ে কাজ করবার ঠিক মুহূর্তটিতে অকস্মাৎ হাজির হয়ে অকাজ করিয়ে সব পণ্ড ক'রে দেয়।"

মুখে একটু হাসি, মনে মনে বলি, 'খুব বুঝি। যাকে বলছ, তার মধ্যেও ঐরকম এক বেয়াড়া মানুষ বাস করে। বন্দুক অবশ্য তার নেই।

কিন্তু অকাজ করবার কৌশল যার আয়ত্তে আছে, বন্দুকের অভাবে তার কোন কাজ পণ্ড করাই আটকায় না। খেলতে যে জানে, কানা-কড়ি দিয়েও সে খেলতে পারে।' পাছে শরৎ প্রশ্রয় পায়—সেই ভয়ে এ কথা প্রকাশ ক'রে বলি নে।

কোন কোন সময়ে শরৎ চেষ্টা ক'রেও লিখে উঠতে পারত না। কখনো কখনো সে আমাকে এমন কথাও বলেছে, "দুঃখের কথা বলব কি উপীন, আজ সমস্ত দিন ধস্তাধস্তি ক'রেও দু লাইনের বেশি লিখতে পারলাম না।"

লেখা জোগানোর বিষয়ে রবীন্দ্রনাথ ও শরৎচন্দ্রের আচরণের বিভিন্নতার মূল কারণ ছিল এইখানেই নিহিত। রবীন্দ্রনাথের কাছে লেখা থাকত আবাহনের অপেক্ষায়; শরৎচন্দ্রের কাছে আরাধনার অপেক্ষায়। নির্ঝরের মতো চিন্তা ঝ'রে পড়বার পক্ষে রবীন্দ্রনাথের নিকট কাগজ এবং কলমের একত্র সমাবেশই ছিল যথেষ্ট; শরৎচন্দ্রের কিন্তু তদতিরিক্ত আরও কিছুর প্রয়োজন হ'ত। রবীন্দ্রনাথের কাছে কল্পনা ছিল সপ্রতিভ যুবতী ভার্যার মতো, ডাক দিলেই তৎক্ষণাৎ হাজির হয়ে বলত, "হুকুম করুন হুজুর"; শরৎচন্দ্রের কাছে ছিল ত্রয়োদশ শতাব্দীর নববধূর মতো, ডাকলেই সব সময়ে সাড়া পাওয়া যেত না, কিছু সাধাসাধি করতে হ'ত। ঠিক এই কারণেই রবীন্দ্রনাথ ছিলেন অনায়াসবাক্ সুবক্তা,—শরৎচন্দ্র কিন্তু তা ছিলেন না।

লেখা পাঠিয়েই শরৎচন্দ্র খালাস হতেন, সে লেখার প্রুফ তিনি দেখতেন না। রবীন্দ্রনাথ কিন্তু তার সব লেখারই প্রুফ দেখতেন। তাই আমরা ভাল কাগজে দু দিকে প্রচুর মার্জিন রেখে তাঁকে প্রুফ পাঠাতাম। প্রুফে তিনি শুধু ছাপার ভুল সংশোধনই করতেন না, সময়ে সময়ে লেখার কিছু পরিবর্তন এবং পরিবর্ধনও করতেন। মনের উদারতার

দিক দিয়ে রবীন্দ্রনাথ যে কত বড় ছিলেন, প্রুফ দেখার মাধ্যমে একবার তার পরিচয় পেয়েছিলাম। কথাটা এইখানে লিপিবদ্ধ করি।

রবীন্দ্রনাথ তখন শান্তিনিকেতনে আছেন, 'যোগাযোগে'র প্রুফ পাঠাতে হবে। প্রুফ পাঠাবার পূর্বে আমি মোটামুটি প্রুফটা একবার দেখে দিতাম,-যাতে বেশি ভুল না থাকে। তেমন বুঝলে সংশোধিত ক'রে নূতন আর এক সেট প্রুফ টানিয়ে নিয়ে পাঠাতাম। প্রুফ পড়তে পড়তে দেখি, এক জায়গায় রবীন্দ্রনাথ লিখেছেন,—'আজ দ্বাদশী তিথি, কুমুর বাপের বাড়ি যাবার দিন স্থির হয়েছে।' প্রুফের কাগজে কোন মন্তব্য না লিখে একটা স্বতন্ত্র টুকরো কাগজে লিখলাম—'যাত্রার হিসেবে দ্বাদশী তিথি শুভ তিথি নয়, ত্রয়োদশী কিন্তু সর্বসিদ্ধি তিথি।' তার পর কাগজের টুকরোটা প্রুফের যথোচিত স্থানে পিন দিয়ে এঁটে শান্তিনিকেতনে প্রুফ পাঠিয়ে দিলাম।

সকালের ডাকে রবীন্দ্রনাথ প্রুফ পেতেন, সেই দিনই তিনি বৈকালের ডাকে সংশোধিত প্রুফ ফেরত পাঠাতেন। অর্থাৎ সোমবারে আমরা যদি প্রুফ পাঠাতাম তো বুধবারে তা আমাদের হাতে ফেরত আসত। আলোচিত প্রুফটি শান্তিনিকেতন থেকে যথাসময়ে ফেরত এল। ঈষৎ কৌতূহলী হয়ে খুলে দেখি, কাগজের টুকরোটি অপসারিত হয়েছে, পশ্চাতে প'ড়ে আছে তার চিহ্ন কাগজের উপর আলপিনের দুটি ছিদ্র; প্রুফে রবীন্দ্রনাথ 'দ্বাদশী' শব্দটি কেটে 'ত্রয়োদশী' ক'রে দিয়েছেন।

মনে মনে খুশি হলাম, কিন্তু বিস্মিত হবার তেমন কারণ ছিল না সেদিন। রবীন্দ্রনাথ কলিকাতায় আসার পর যে দিন কথায় কথায় দ্বাদশী-ত্রয়োদশীর প্রসঙ্গ উঠেছিল, সে দিন তিনি যে-কথা বলেছিলেন তা শুনে কিন্তু খুশিই শুধু হই নি, বিস্মিতও হয়েছিলাম যথেষ্ট। রবীন্দ্রনাথ বলেছিলেন, "ওহে উপেন, ও-রকম সাধারণ ভুল-ভ্রান্তি আমাকে না

জানিয়ে তুমি নিজেই ঠিক ক'রে নিও। আমি তোমাকে লেখা দিই **subject to your right of editing.**"

শক্তি যেখানে অপ্রমেয়, সেখান থেকেই বোধ করি বিনয়ের এতটা উদার উক্তি প্রত্যাশা করা যায় ; দাবি করা যায় কি না, বলতে পারি নে। হিসাবমতো হয়তো যায় ; কিন্তু কিছুকাল পূর্বে লেখার উন্নতি সাধন করবার অধিকার প্রয়োগ করতে গিয়ে যে তিক্ত শিক্ষালাভ করেছিলাম তাতে নবকুমারের মতো মনে মনে প্রতিজ্ঞা করেছিলাম, লেখকের উপকার করবার সদুদ্দেশ্যে আর কখনও লেখনী ধারণ করছি নে। তাই রবীন্দ্রনাথের মন্তব্য শুনে সে দিন খুশি যতটা হয়েছিলাম, বিস্মিত হয়েছিলাম বোধ করি ততোধিক। সত্যি, সাধারণে ও অ-সাধারণে কতই না তফাত ! সাধারণ সর্বদা ভয় করে, খর্ব না হই ; অ-সাধারণ ভয় করে, খর্ব না করি।

মাসে মাসে ধারাবাহিকভাবে 'বিচিত্রা'য় রবীন্দ্রনাথের 'যোগাযোগ' উপন্যাস প্রকাশিত হবার প্রসঙ্গ নিয়ে লেখা আরম্ভ করেছিলাম। কথায় কথায় অনেক অপ্রাসঙ্গিক কথার আলোচনা হয়ে গেল। কিন্তু অপ্রাসঙ্গিক কথা সব সময়ে অবান্তর কথা নয়,— যেমন ফাঁকা সব সময়ে ফাঁকি নয়।

সে যাই হোক, 'বিচিত্রা'য় 'যোগাযোগ' উপন্যাসের ধারাবাহিকতা যাতে ক্ষুণ্ণ না হয়ে বজায় থাকে, তার ব্যবস্থা করবার জন্য রবীন্দ্রনাথ আমাকে একবার শান্তিনিকেতনে আহ্বান ক'রে নিয়ে গিয়েছিলেন। রবীন্দ্রনাথের অতিথিস্বরূপ শান্তিনিকেতনে থাকাকালে ঘটনাচক্রে রবীন্দ্রনাথ আমার প্রসঙ্গে একদিন যৎপরোনাস্তি উত্তেজিত হয়ে বলেছিলেন, "তার লাশ নিয়ে এসো। আমি তার লাশ দেখতে চাই।" বলা বাহুল্য, 'তার লাশ' অর্থে রবীন্দ্রনাথের নিজ আমন্ত্রিত অতিথির, অর্থাৎ আমার লাশ।

এবার সেই কৌতুকাবহ কাহিনীটা শোনাই।

কটক র‍্যাভেন্‌শ' কলেজের অধ্যাপক নির্মল আমার দূরসম্পর্কের আত্মীয়। কলিকাতায় এসে সে আমাকে ধ'রে বসল, তাদের কলেজের প্রাক্তন ছাত্রদের উৎসব-অধিবেশনে সভাপতিরূপে রবীন্দ্রনাথকে যোগাড় ক'রে দিতে হবে।

বোধ হয় আমাকে উৎসাহিত করবার জন্যই সে বললে, "আপনার তো এখন রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে খুব দহরম-মহরম!"

বললাম, "দহরম-মহরম কি না বলতে পারি নে; তবে আমি তোমার জন্যে চেষ্টা করব।"

নির্মল বললে, "আপনি চেষ্টা করলে নিশ্চয়ই হবে কিন্তু চিঠিপত্রের দ্বারা চেষ্টা ক'রে ঠিক হবে না, শান্তিনিকেতনে গিয়ে তাকে ধ'রে পড়তে হবে। আমরা খুশি হয়ে খরচপত্র ক'রে আপনাকে সেখানে নিয়ে যাব।"

বললাম, "খুশি হ'য়ো আপত্তি নেই, কিন্তু খরচপত্র ক'রে নিয়ে যেতে হবে না। শান্তিনিকেতন থেকে রবীন্দ্রনাথ ডাক দিয়েছেন, কয়েক দিনের মধ্যেই সেখানে আমি যাচ্ছি।"

খরচপত্র ক'রে নিয়ে যেতে হবে না শুনে নির্মল বোধ হয় একটু বেশি খুশিই হ'ল; উৎফুল্ল কণ্ঠে বললে, "শান্তিনিকেতনে যাচ্ছেন? কবে যাচ্ছেন?"

বললাম, "দিন ঠিক ক'রে আজ বলতে পারছি নে, তবে সপ্তাহ খানেকের মধ্যে নিশ্চয়ই।"

নির্মল বললে, "কাল কটকে আমার বিশেষ প্রয়োজন আছে, সেই জন্যে থেকে যেতে পারছি নে। আপনি কদিন সেখানে থাকবেন?"

বললাম, "পাঁচ-সাত দিন থাকা সম্ভব।"

"তা হ'লে রওনা হবার দিন আপনি অনুগ্রহ ক'রে কটকে আমাকে একটা টেলিগ্রাম ক'রে দেবেন, আমি সঙ্গে সঙ্গে শান্তিনিকেতন রওনা হব।"

"তথাস্তু।"

কয়েকদিন পূর্বে রবীন্দ্রনাথের আহ্বান পেয়েছি শান্তিনিকেতনে যাবার জন্যে। হিবার্ট লেকচার দিতে তাঁকে বিদেশ যেতে হচ্ছে, সুতরাং দেশ থেকে তাঁকে কিছুদিন বাইরে থাকতে হবে। 'বিচিত্রা'য় 'যোগাযোগ' নামে তার যে উপন্যাস প্রকাশিত হচ্ছে, বাংলা দেশে তাঁর অনুপস্থিতি হেতু তার ধারাবাহিকতা ছিন্ন হয়—এ তিনি একেবারেই পছন্দ করেন না। তাই আমাকে লিখেছেন, "আমি প্রত্যহ নিরবসর উদ্যমে 'যোগাযোগ' লিখে চলেছি। অনেক জমেছে। কয়েক দিনে আরও অনেক জমবে। তুমি একজন লিখিয়ে সঙ্গে নিয়ে এসে এখানে কয়েক দিন থেকে সবটা কপি করিয়ে নিয়ে যাও।"

নির্মলের সহিত কথোপকথনের দিন তিনেক পরে বিনোদবিহারী গুপ্তকে সঙ্গে নিয়ে আমি শান্তিনিকেতন রওনা হলাম।

বিনোদবিহারী গুপ্ত আমাদের বিচিত্রা-নিকেতনের কর্মচারী। রিপন কলেজের তদানীন্তন অধ্যাপক 'পুরাতন-প্রসঙ্গ'-গ্রন্থপ্রণেতা বিপিনবিহারী তাঁর অগ্রজ। বিনোদবাবুর বয়ঃক্রম পঞ্চাশ বৎসরের কাছাকাছি; গায়ের রঙ কৃষ্ণবর্ণ; দেহ স্বাস্থ্যপূর্ণ; প্রকৃতি ঋজুভাবে খাড়া; জিহ্বা সাধারণত কিছু কড়া। কানে বেশ একটু কম শোনেন; কিন্তু কানে যতটুকু কম শোনেন, চোখে তার চতুর্গুণ বেশি দেখেন। তাই হিসাবের খাতার ভুল-ভ্রান্তি থেকে আরম্ভ ক'রে বইয়ের শেল্‌ফের অসাধু হস্তক্ষেপ পর্যন্ত কিছুই তাঁর শ্যেনদৃষ্টি এড়ায় না। এই সকল গুণের সহিত কানে

কম শোনা গুণের সমবায়ে তিনি একজন উঁচুদরের কাজের মানুষ। কাজ করবার সময়ে এবং কাজ করাবার সময়ে অনেক লঘু-গুরু কথাই তিনি কানে তোলেন না।

শান্তিনিকেতনে পৌঁছে দেখলাম, গেস্ট হাউসে একটি প্রশস্ত কক্ষ আমার জন্য ঠিক ক'রে রাখা হয়েছে; বিনোদবাবুর থাকবার ব্যবস্থা অন্যত্র। কিন্তু কাজের সুবিধার জন্য আমার ঘরেরই এক দিকে একটি পালঙ্ক পাতিয়ে বিনোদবাবুর থাকবার বন্দোবস্ত ক'রে নিলাম।

সমস্ত দিন বিনোদবাবু ঘাড় নিচু ক'রে 'যোগাযোগে'র একরাশ পাণ্ডুলিপি নিয়ে নকল করার কাজে ব্যস্ত থাকেন। আমি সকাল-সন্ধ্যা কবির দরবারে হাজিরা দিই, মধ্যাহ্নে ও রাত্রে কবির সহিত আহার করি এবং ফালতু সময়ে এদিক-ওদিক ঘুরে বেড়াই। কখনো কলাভবনে গিয়ে ছবি দেখি, কখনো গুরুপল্লীতে গিয়ে শিল্পাচার্য নন্দলাল বসুর সহিত ভারতীয় চিত্রকলা সম্বন্ধে তর্ক বাধাই, কখনো-বা সঙ্গীতবিদ্ দিনেন্দ্রনাথ ঠাকুরের গৃহে উপস্থিত হয়ে সঙ্গীত বিষয়ে আলোচনা জমাই।

কলিকাতা থেকে রওনা হবার পূর্বে কটকে নির্মলকে টেলিগ্রাম ক'রে এসেছিলাম। আমাদের শান্তিনিকেতনে পৌঁছবার দিন দুই পরে একদিন বৈকালের দিকে নির্মল এসে উপস্থিত হ'ল। তার ইচ্ছা, সেই দিনই কার্যোদ্ধার ক'রে রাত্রের ট্রেনে কলিকাতায় ফেরে।

আমি বললাম, "তা হবে না নির্মল, কাল সকাল পর্যন্ত তোমাকে অপেক্ষা করতেই হবে। দরবার করতে হয় দরবারকের সময়-সুবিধা অনুযায়ী নয়, দরবারীর সময়-সুবিধার প্রতি লক্ষ্য রেখে। আজ সন্ধ্যায় কবি ব্যস্ত থাকবেন অভিনয়ের মহলা দেওয়ার কাজে। আজ যদি তোমার কথায় একান্ত কর্ণপাত করেন তো উৎকর্ণ হয়ে করবেন না। প্রার্থনার

সর্বশ্রেষ্ঠ সময় হচ্ছে সারা রাত্রির বিশ্রামের পর সকালবেলা। কাল বেলা আটটার সময়ে তোমার দর্শনের ব্যবস্থা ক'রে রেখেছি।"

নির্মল বললে, "তবে আর কথাই নেই, কাল সকালেই রবীন্দ্রনাথের কাছে যাওয়া যাবে। আজ আমাকে খানিকটা শান্তিনিকেতন ঘুরিয়ে নিয়ে আসুন।"

চা-খাবার খাওয়ার পর নির্মলকে নিয়ে বেরিয়ে পড়লাম। প্রধানত পথে পথেই ঘুরে বেড়াতে লাগলাম। কোথাও দু-চারজন পরিচিত লোকের সহিত দেখা হয়, দু-দশ মিনিট গল্প করি; কখনো-বা আলাপী লোকের আহ্বানে পথের ধারের সাঁকোর ইট-বাধানো আলিসার উপর ব'সে ক্ষণকাল আড্ডা দিই। ঘণ্টা দুই পরে যখন গেস্ট হাউসের দিকে অগ্রসর হলাম, তখন রাত্রি হয়েছে, পথে পথে উজ্জ্বল আলো জ্ব'লে উঠেছে।

পথ ছেড়ে গেস্ট হাউসের হাতায় প্রবেশ করলাম। চতুর্দিকে দীর্ঘ সরল বৃক্ষের শ্রেণী, পায়ের নীচে ভূমিতল পত্রচ্ছায়া ও আলোকের নক্শায় খচিত। সেই সাদা-কালোর চোখ-ধাঁধানো পথে চলতে চলতে গেস্ট হাউসের চতুর্দিক-বেষ্টিত পাকা নালির একেবারে ধারে এসে পড়েছি। নালি ডিঙিয়ে কয়েক পা অগ্রসর হ'লেই গেস্ট হাউসের সিঁড়ি। এমন সময়ে অকস্মাৎ এক অভাবনীয় কাণ্ড ঘটল। সবিস্ময়ে দেখি, বিনা বাধাদানের সুযোগে সেরেফ উপুড় হয়ে মাটিতে শুয়ে পড়েছি, আর পিঠের উপর ভার—বুঝলাম নির্মল।

বললাম, "নির্মল, একটু সরো, আমি উঠি।"

কাতরকণ্ঠে নির্মল বললে, "আজ্ঞে, সরি। ডান পাটা একটু আটকে গিয়েছে, বোধ হয় নালায় পড়েছি।"

ব্যাপার যা ঘটেছে, বুঝতে বাকি রইল না। অজানা জায়গায়

আলো-অন্ধকারের আবছায়ায় নালিটা নির্মল ঠাহর করতে পারে নি। অজ্ঞাতসারে নালি টপকাবার সময়ে তার বাঁ পা পড়েছে ডাঙায়, ডান পা ফাঁকে। এই অসতর্ক মুহূর্তের অসহায় অবস্থায় বিমূঢ় হয়ে সে নিকট-লভ্য একমাত্র অবলম্বন আমার কোমর জড়িয়ে ধ'রে আমাকে মাটিতে ফেলে নিজে আমার পিঠের উপর শয়ন করেছে।

কোন রকমে নির্মলের চাপ থেকে নিজেকে মুক্ত ক'রে দাঁড়িয়ে উঠে দেখি, তার হাঁটু পর্যন্ত ডান পা গভীর নালির মধ্যে অবস্থান করছে। দু হাত ধ'রে তাকে তুলে দাঁড় করালাম। ডান পায়ে বোধ হয় কিছু বেশি রকম চোট লেগে থাকবে, সোজাভাবে পা পাততে পারছে না, দেড় পায়ে দাঁড়িয়ে হাসি-হাসি কান্না-কান্না মুখে আমার দিকে চেয়ে রইল।

দুঃখার্ত কণ্ঠে জিজ্ঞাসা করলাম, "খুব লেগেছে নির্মল ?"

"ডান পাটা জ্বালা করছে, বোধ হয় কেটে গেছে।"

"হেঁটে যেতে পারবে ?—না, চেয়ার আনব ?"

মাথা নাড়া দিয়ে নির্মল বললে, "চেয়ার আনবার দরকার নেই, আপনার কাঁধে একটু ভর দিয়ে যেতে পারব।"

অনুতপ্ত স্বরে বললাম, "অন্যায় হয়ে গেছে আমার। তুমি নতুন মানুষ, নালির বিষয়ে তোমায় সতর্ক ক'রে দেওয়া উচিত ছিল।"

ব্যস্ত হয়ে নির্মল বললে, "না না, সতর্ক আবার কি করিয়ে দেবেন ? অত স্পষ্ট নালি, যাবার সময়ে দেখে গেছি, আমারই অন্যায় হয়েছিল অসাবধান হয়ে চলা।"

ডান হাত দিয়ে আমার গলা জড়িয়ে ধ'রে ধীরে ধীরে নির্মল গেস্ট হাউসের সিঁড়ির দিকে অগ্রসর হ'ল। সিঁড়ি বেশি নয়, মাত্র চার-পাঁচ ধাপ,—কিন্তু সেই চার-পাঁচ ধাপ উঠতেই হয়তো তার খুব কষ্ট হবে ব'লে

আশঙ্কা করেছিলাম। কিন্তু কার্যকালে সিঁড়ি ভাঙতে বিশেষ কষ্ট হ'ল না। বাঁ পায়ে ভর দিয়ে দিয়ে সে সিঁড়ি শেষ করলে।

নিবিড় বন্ধনে জড়িত হয়ে আমাদের দুজনকে কক্ষে প্রবেশ করতে দেখে বিনোদবাবু লেখা ফেলে উদ্বিগ্ন মুখে তাড়াতাড়ি উঠে দাঁড়ালেন।

"কি ব্যাপার?"

সংক্ষেপে ঘটনা বিবৃত করলাম।

বিনোদবাবু একটি যে কাণিকা-সংস্করণের ডাক্তার এবং দুর্ঘটনার ক্ষেত্রে প্রাথমিক সাহায্যের কিছু-কিছু উপকরণ সর্বদা তাঁর কাছে থেকে—সে কথা পূর্বে জানা ছিল না, সেই দিনেই অবগত হলাম।

তাড়াতাড়ি নির্মলের সামনে উপস্থিত হয়ে ব'সে প'ড়ে বিনোদবাবু বললেন, "ইস্! অনেকখানি কেটে গিয়েছে!" তার পর ডান পাটা টিপে-টুপে দেখে বললেন, "না, হাড় ভাঙে নি। তবে নর্দমায় কেটেছে, একটু বিশেষ সাবধান হওয়া দরকার।"

নিজের ট্রাঙ্ক খুলে তিনি কার্বলিক সোপ, টিঞ্চার আয়োডিনের শিশি, একটু বোরিক কটন এবং খানিকটা পরিষ্কার নেকড়া বার করলেন; তার পর নির্মলকে বাথরুমে নিয়ে গিয়ে ক্ষতস্থান ও আশপাশ কার্বলিক সোপের দ্বারা ভাল ক'রে ধুইয়ে দিয়ে টিঞ্চার আয়োডিনে বোরিক কটন জবজবে ক'রে ভিজিয়ে ক্ষতস্থানের উপর বসিয়ে দিলেন; তার পর নেকড়া দিয়ে ভাল ক'রে ব্যাণ্ডেজ বাঁধলেন।

ব্যাণ্ডেজ বাঁধা দেখে বুঝলাম, বিনোদবাবুর হাত আনাড়ীর হাত নয়, অভ্যস্ত হাত।

বিনোদবাবু বললেন, "নর্দমা হ'লেও কলকাতার নর্দমা নয়, শান্তিনিকেতনের নর্দমা—পরিষ্কার আর শুকনো, ভয়ের কোনো কারণ

বেশি নেই। কিন্তু দিন দুই ব্যাণ্ডেজ খুলবেন না। কাল সকালে আবার ভাল ক'রে এঁটে দোব।"

পরদিন সকালে নির্মলের ঘুম ভাঙলে জিজ্ঞাসা করলাম, "কেমন বোধ করছ নির্মল ?

শয্যা থেকে অবতরণ ক'রে একটু চ'লে-ফিরে দেখে প্রসন্নমুখে নির্মল বললে, "ভালই। ব্যথা টের পাচ্ছি নে, তবে যেখানটা কেটে গিয়েছিল, এখনো একটু চিন্‌চিন্ করছে।"

"যেতে পারবে তো ?"

একমুখ নিঃশব্দ হাসি হেসে নির্মল বললে, "অতি অবশ্য।"

চা-খাবার খেয়ে ঠিক আটটার সময়ে নির্মলকে নিয়ে উত্তরায়ণে উপস্থিত হলাম। কবি আমাদের জন্যে অপেক্ষা করছিলেন, তাঁর নিকট উপস্থিত হয়ে আমরা প্রণাম করলাম।

আমাদের বসতে ব'লে রবীন্দ্রনাথ সাধারণভাবে দু-চারটে আলাপ-আলোচনা করলেন। যদিও আমি নির্মলের দেখা করার উদ্দেশ্যের কথা মোটামুটি রবীন্দ্রনাথকে জানিয়ে রেখেছিলাম, তথাপি সাক্ষাৎভাবে নির্মলেরই অনুরোধ করা উচিত মনে ক'রে বললাম, "এবার নির্মল, তুমি তোমার আবেদন পেশ কর।"

আমার কথা শুনে প্রথমটা একটু ঘাবড়ে গিয়ে নির্মলের মুখ আরক্ত হয়ে উঠল ; পর-মুহূর্তেই কিন্তু নিজেকে সংহৃত ক'রে নিয়ে সে বলতে আরম্ভ করলে, "আমাদের কটক র‍্যাভেন্‌শ' কলেজে একটি ওল্ড্‌ বয়েজ অ্যাসোসিয়েশন আছে, প্রতি বৎসর একবার ক'রে তার উৎসব হয়। প্রতিবারেই বাইরের কোনও খ্যাতনামা ব্যক্তিকে সভাপতি ক'রে আমরা নিয়ে আসি। এ বৎসর আপনাকে সভাপতি করবার উচ্চাভিলাষ

আমাদের মনে জাগ্রত হওয়ায় সমস্ত কটক মেতে উঠেছে। স্বয়ং রায় বাহাদুর জানকীনাথ বসু উৎসবের নেতৃত্ব গ্রহণ করতে উদ্যত হয়েছেন। আপনি দয়া ক'রে সম্মত হোন—আমি টেলিগ্রাম ক'রে দিই। সমস্ত কটক শহর শান্তিনিকেতনের দিকে উদ্‌গ্রীব হয়ে তাকিয়ে আছে।" তার পর, কবে যেতে হবে, কোন্ পথে যাওয়া সুবিধা, কদিন রবীন্দ্রনাথকে কটক ধ'রে রাখতে চাইবে ইত্যাদি বিষয়ে কতকটা আভাস দিলে।

নির্মলের কথা শুনতে শুনতে রবীন্দ্রনাথের চক্ষু কুঞ্চিত হয়ে এসেছিল; ঈষৎ অপ্রসন্ন কণ্ঠে তিনি বললেন, "এ কিন্তু তোমাদের ভারি অসঙ্গত অনুরোধ। আমি কি একটা আসবাব, না, একটা অলঙ্কার যে, আমাকে নিয়ে গিয়ে আসর সাজাবে? এর চেয়ে যদি বল—মশায়, আমার ভাইঝির বিয়ে, আপনাকে একটা উপহার ছাপাবার কবিতা লিখে দিতে হবে, তাতে লিখে দিই আর না দিই—এ কথা আমাকে স্বীকার করতেই হবে, তোমাদের দাবি অসঙ্গত নয়, কারণ আমি একজন কবি। কিন্তু যে অনুরোধ আমাকে করছ, তার কোনো অর্থ আছে কি?" তার পর আমার প্রতি দৃষ্টিপাত ক'রে বললেন, "আমি কিন্তু তোমার বুদ্ধির সুখ্যাতি করতে পারি নে উপেন।"

বললাম, "সেজন্যে দুঃখ করি নে, কারণ এ পর্যন্ত কেউ আমার বুদ্ধির সুখ্যাতি করে নি; কিন্তু তবু জানতে ইচ্ছে হচ্ছে, কেন করেন না!"

রবীন্দ্রনাথ বললেন, "তোমারই 'বিচিত্রা'য় 'যোগাযোগ' যাতে মাসে মাসে বের হতে পারে, যাতে তার ধারাবাহিকতা নষ্ট না হয়, সেজন্যে আমি দিবারাত্র লিখে চলেছি, আর তুমি কি-না যোগাড়-যন্ত্র ক'রে আমাকে তার মধ্যে সাত-আট দিনের জন্যে কটকে পাঠাতে চাও? আসল কথা কি জানো? আমি হচ্ছি আমার লেখার জনক, আর তুমি শ্বশুর; তোমার চেয়ে আমার দরদ অনেক বেশি।"

এ কথার তাৎপর্য হচ্ছে, রবীন্দ্রনাথ তাঁর লেখা সৃষ্টি করেন ব'লে তিনি তাঁর লেখার জনক; আর সৃষ্টির পর সে লেখা আমার ঘরে অর্থাৎ 'বিচিত্রা'য় আসে ব'লে আমি তার শ্বশুর। আর শ্বশুরের চেয়ে জনকের দরদ বেশি বললে সহসা আপত্তি করাও তো যায় না! উপমারাজ উপমার চালে আমাকে কিস্তিমাৎ করতে উদ্যত হয়েছেন। এ থেকে উদ্ধার পাবার একমাত্র উপায় পাল্টা-উপমার কিস্তি দেওয়া। বললাম, "কিছু যদি মনে না করেন, একটা কথা বলি।"

রবীন্দ্রনাথ বললেন, "কি বলবে বল না?"

বললাম, "আপনি হচ্ছেন বিয়ের রাত্রের বরকর্তা, বিয়ে হ'লে আপনি খুশি; আর, আমি হচ্ছি বিয়ের রাত্রের কন্যাকর্তা, বিয়ে না হ'লে আমার জাত যাবে।"

অর্থাৎ, রবীন্দ্রনাথের লেখা 'বিচিত্রা'য় বার হ'লে রবীন্দ্রনাথ খুশি; কিন্তু বার না হ'লে আমার সর্বনাশ, 'বিচিত্রা'র পাঠকসমাজে আমাকে জাতিচ্যুত হতে হবে।

আমার কথা শুনে রবীন্দ্রনাথ মুখে কোনো উত্তর দিলেন না; কিন্তু লক্ষ্য করলাম, তিনি মৃদু মৃদু পা দোলাচ্ছেন। এটা খুশি হওয়ার লক্ষণ অনুমান ক'রে বুঝলাম, উপমার পাল্টায় কিছু উপকার হয়েছে। সুযোগের সুবিধা যদি নিতে হয় তো এখনি ব্রহ্মাস্ত্র নিক্ষেপ করার প্রয়োজন। বললাম, "এ ভদ্রলোক কাল শান্তিনিকেতনে পা দিয়েই একটা দারুণ শারীরিক অশান্তি ভোগ করেছেন; তার উপর আজ যদি মানসিক অশান্তিও ভোগ করতে হয়, তা হ'লে কলকাতার পথে ফিরে যেতে যেতে এই কথাই তাঁকে বারংবার ভাবতে হবে যে, জায়গাটার নাম আর যাই হোক না কেন, শান্তিনিকেতন হওয়া কিছুতেই উচিত হয় নি।"

ব্যস্ত হয়ে রবীন্দ্রনাথ বললেন, "কেন, কেন? কাল কি শারীরিক অশান্তি ভোগ করেছিলেন?"

বললাম, "এঁর ডান পা-টা একবার দেখলেই সে কথা বুঝতে পারবেন।"

নির্মলের দিকে তাকিয়ে দেখি, আমার কথা শুনে ব্যস্ত হয়ে সে তার পায়ের কাপড় তলার দিকে আরও খানিকটা নামিয়ে দিয়ে ব্যাণ্ডেজ ঢাকবার চেষ্টা করছে। মৃদু স্বরে বললাম, "ভুল ক'রো না নির্মল, ঐখানেই তোমার যা-কিছু সম্ভাবনা অপেক্ষা করছে। কাপড় সরিয়ে ব্যাণ্ডেজ দেখাও।"

আমার কথায় অগত্যা বাধ্য হয়ে কুণ্ঠিতভাবে নির্মল তার পায়ের কাপড় একটু তুলে ধরলে।

শিউরে উঠলেন রবীন্দ্রনাথ।—"তাই তো হে! কি হয়েছিল বল দেখি?"

বললাম, "গেস্ট হাউসের চতুর্দিকে গভীর নালা বাঁধিয়ে আপনারা মানুষ-মারা কল বানিয়ে রেখেছেন। সন্ধ্যার পর বেড়িয়ে ফেরবার সময়ে নির্মল তার মধ্যে পা ঢুকিয়ে নিজেও পড়েছিল, আমাকেও ফেলেছিল।" ব'লে সবিস্তারে কাহিনীটা বিবৃত করলাম।

রবীন্দ্রনাথের মুখে অতি ক্ষীণ হাসি দেখা দিল—সে হাসি সমবেদনার অথবা কৌতুকের তা ঠিক বোঝা গেল না, হয়তো দুইয়েরই। বললেন, "হ্যাঁ হে, ও-নালাটা সত্যিই একটু বিপজ্জনক। দুবার দুজন মেম ঐ নালাতে পা ঢুকিয়ে প'ড়ে গিয়েছিল।"

বললাম, "এবার আমরা কলকাতায় ফিরে গিয়ে শান্তিনিকেতনের ঐ নালা বোজাবার আন্দোলন আরম্ভ করব স্থির করেছি।"

রবীন্দ্রনাথ হাসতে লাগলেন; এবং শেষ পর্যন্ত ব্যাণ্ডেজ দেখে দুঃখিত

হয়েই হোক অথবা উপমার পাল্টায় খুশি হয়েই হোক, কটক যাত্রার প্রস্তাবে সম্মতি দিলেন। ধন্যবাদ জানিয়ে মহা আনন্দে আমরা গেস্ট হাউসে ফিরলাম।

কার্যগতিকে কিন্তু শেষ পর্যন্ত রবীন্দ্রনাথের কটক যাওয়া হয়ে ওঠে নি। এমন কি, যতদূর মনে পড়ছে, সে বৎসর রবীন্দ্রনাথের হিবার্ট লেকচার দেওয়াও পেছিয়ে গিয়েছিল। তা যাক,—সে কথা বাহ্য, এবার আগে চলি, অর্থাৎ 'লাশ নিয়ে এসো' কাহিনী বলি।

এ পর্যন্ত যতটুকু বললাম, 'লাশ নিয়ে এসো' কাহিনীর তা উপক্রমণিকা অংশ

কার্যোদ্ধার ক'রে প্রসন্নচিত্তে নির্মল কটক রওনা হ'ল। তার দিন-দুই পরের কথা।

সকালে উঠে চা পান্ ক'রে যথানিয়মে উত্তরায়ণে যাবার উদ্যোগ করছি, এমন সময়ে শান্তিনিকেতনের সঙ্গীত-বিভাগের অধ্যক্ষ পণ্ডিত ভীমরাও শাস্ত্রী এসে হাজির। হাতে দুখানি বই—প্রথমটি দেবনাগরী অক্ষরে মুদ্রিত 'গীতাঞ্জলি'র গান ও স্বরলিপি, অপরটির নাম যতদূর মনে পড়ছে—'রাগমালা'। 'গীতাঞ্জলি' শাস্ত্রী মহাশয়ের সম্পাদিত গ্রন্থ; 'রাগ-মালা' বিরচিত। বই দুখানি আমার হাতে দিয়ে বললেন, "অনুগ্রহ্ ক'রে "বিচিত্রা'য় এ দুটি গ্রন্থের সমালোচনা করিয়ে দিলে কৃতজ্ঞ হব।"

বই দুখানি নিয়ে ধন্যবাদ জানিয়ে বললাম, "নিশ্চয়ই করিয়ে দোব।"

'গীতাঞ্জলি' জানা বই, সে সম্বন্ধে ঔৎসুক্য তেমন-কিছু ছিল না; কয়েকটি প্রধান রাগের পরিচয় এবং তৎসংক্রান্ত গানের স্বরলিপি সম্বলিত 'রাগমালা' কিন্তু সম্পূর্ণ নূতন বই। বইখানা খুলে একটা গানের স্বরলিপির প্রতি দৃষ্টি নিবদ্ধ ক'রে মৃদুস্বরে গুনগুন করছি, এমন সময়ে ঘাড় বেঁকিয়ে নিবিড় কৌতূহলের সহিত আমাকে নিরীক্ষণ করতে করতে বিস্ময়চকিত কণ্ঠে ভীমরাও বললেন, "কি ব্যাপার!"

বললাম, "কেন বলুন তো?"

"স্বরলিপি দেখে সুর তুলছেন!—আর, কোনো যন্ত্রের সাহায্য না নিয়েই!"

হাসিমুখে বললাম, "এক সময়ে অভ্যেস ভালই ছিল, এখনো কিছু আছে।"

বাক্য এবং ভঙ্গীর সাহায্যে ভীমরাও শাস্ত্রী এমন প্রচুর পরিমাণে বিস্ময়ের বাষ্প নিষ্কাশিত করতে লাগলেন যে, একটা যেন অপরাধেরই মতো কোন-কিছুর স্বীকৃতিতে খানিকটা অপ্রতিভ বোধ করতে লাগলাম। 'ভারতবর্ষ'-সম্পাদক শ্রদ্ধাস্পদ জলধর সেন এবং 'প্রবাসী'-সম্পাদক শ্রদ্ধেয় রামানন্দ চট্টোপাধ্যায়ের মতো অমন দুই অসঙ্গীতীয় সাধু দৃষ্টান্ত বর্তমান থাকতে 'বিচিত্রা'-সম্পাদক হয়েও বিনা যন্ত্রের সাহায্যে স্বরলিপি তোলা, অপরাধ না-ই যদি-বা হয়, একটা গুরুতর অসঙ্গতি— এমনি ধরনের বোধ হয় কিছু শাস্ত্রী মহাশয় মনে করছিলেন। সঙ্গীত এবং সম্পাদনা একান্তই যেন দুই অমিত্র বস্তু।

কিছু কৈফিয়ৎ দেওয়ার প্রয়োজন বোধ করলাম। সহাস্য মুখে বিনীত কণ্ঠে বললাম, "'বিচিত্রা'র সম্পাদন-ভার নেওয়ার কিছু পূর্বে সঙ্গীত বিষয়ে যৎসামান্য অপরাধ ক'রে ফেলেছিলাম শাস্ত্রী মশায়। সেটুকুর জন্য মাসিকপত্রের সম্পাদন-ভার গ্রহণ যে অবৈধ হবে, তা বুঝতে পারি নি।"

ভীমরাও ব্যস্ত হয়ে উঠলেন। সুইচ তুলে বিস্ময়ের দীপকে নিবিয়ে দিয়ে অন্য সুইচ নামালেন; বললেন, "না না, অবৈধ হবে কেন! এ তো খুব আনন্দের কথা। গুণের যোগ কখনো অবৈধ হয়?" তাঁর মুখমণ্ডল আনন্দের আলোকে উদ্ভাসিত!

সঙ্গীত বিষয়ে কিছুক্ষণ আলাপ-আলোচনা চলল। যাবার পূর্বে ভীমরাও বললেন, "আজ সন্ধ্যার সময়ে দয়া ক'রে যদি আমার কুটিরে আসেন, আপনাকে কিছু যন্ত্র-সঙ্গীত শোনাই।"

খুশি হয়ে বললাম, "সানন্দে আপনার নিমন্ত্রণ গ্রহণ করলাম। নিশ্চয় যাব।"

"আর, ওখানেই চা খাবেন।"

"তা-ও খাব।"

ভীমরাও শাস্ত্রী প্রস্থান করার কিছুক্ষণ পরে উত্তরায়ণে হাজির হলাম। তখন পুরোদমে কবিগুরুর প্রভাত-সভার অধিবেশন চলছে। কথায়-বার্তায় হাস্যে-কৌতুকে কবিতা-পাঠে সভা একেবারে জমজমাট। নির্ঝরিণী হতে জলরাশির ন্যায় গুরুদেবের মুখ হতে কৌতুক মধুর প্রভৃতি নানা রসাশ্রিত বাধ্যসুধা নির্গত হয়ে নিমেষের মধ্যে ভক্তজনচিত্তকে সরস ক'রে বিস্মৃতির সুদূর সাগর অভিমুখে ধাবিত হচ্ছে। কোনো অনুলিপিকার ( Short-hand writer ) উপস্থিত থাকলে দু-চার কুম্ভ ভ'রে নিয়ে বাংলা-সাহিত্যের সম্পদ বৃদ্ধি করতে পারা যেত।"

ঘড়ির কাঁটা এগারোটার ঘরে প্রবেশ করতে উদ্যত হয়েছে, দু-চারজন সভাসদ্ সভা-কক্ষ ত্যাগ ক'রে বেরিয়ে যাচ্ছেন, বোঝা যাচ্ছে সভাভঙ্গের সময় আসন্ন হয়েছে।

শান্তিনিকেতনের গ্রন্থাগারিক শ্রীযুক্ত প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায় সভায় উপস্থিত ছিলেন; আমার প্রতি দৃষ্টিপাত ক'রে তিনি বললেন, "উপেনবাবু, আজ রাত্রে আমার বাড়িতে আহার করবেন?"

সন্ধ্যায় ভীমরাও শাস্ত্রীর গৃহে চা-পানের নিমন্ত্রণ, রাত্রে প্রভাতবাবুর গৃহে নৈশ ভোজনের;—বুঝলাম, যে-কোনো কারণেই হোক, সহসা জনার্দন ভক্তের প্রতি সদয় হয়েছেন; বললাম, "আমি তো আপনাদের এখানে অতিথি; অনুগ্রহ ক'রে খাওয়ালেই খাব।"

প্রসন্নমুখে প্রভাতবাবু বললেন, "ধন্যবাদ। কি খাবেন বলুন?"

বললাম, "যা খেলে আমি খুশি হব, তা-ই বলব তো?"

"আচ্ছা তা-ই বলুন।"

"খান কয়েক লাল আটার রুটি, একটু ডাল; আর কিছু তরকারি।"

প্রফুল্ল কণ্ঠে প্রভাতবাবু বললেন, জাঁতায় ভাঙা টাটকা লাল আটা আছে।"

বললাম, "খাসা হবে।"

রবীন্দ্রনাথ বললেন, "তোমার তো আচ্ছা আক্কেল উপেন! অমন স্থযোগটা হাতে পেয়ে মাত্র লাল আটার রুটির ওপর হারালে? বলা উচিত ছিল, পোলাও মাংস আর পোয়াটাক ঘন ক্ষীর খাব।"

একটি উচ্চ হাস্যে কক্ষ চকিত হয়ে উঠল।

সন্ধ্যার পূর্বে বেশ পরিবর্তন ক'রে ভীমরাও শাস্ত্রীর গৃহে যাবার জন্য প্রস্তুত হলাম। বিনোদবাবু ঘাড় নিচু ক'রে সমানে 'যোগাযোগ' কপি ক'রে চলেছেন, নিকটে গিয়ে ডাকলাম, "বিনোদবাবু!"

"আজ রাত্রে আমার নেমন্তন্ন আছে।"

মুখ না তুলেই কপি করতে করতে বিনোদবাবু বললেন, "জানি।"

জানি মানে? আমার নিমন্ত্রণ তো হয়েছিল সকালবেলায় উত্তরায়ণে, গেস্ট হাউসে ব'সে ইনি সে কথা জানলেন কেমন ক'রে? মরুকগে, জানেন তো জানেন! কালা মানুষ,—অনর্থক চেচামেচি ক'রে কি লাভ? একটু দেরি হয়ে গিয়েছিল, তাড়াতাড়ি বেরিয়ে পড়লাম।

'জানি'র তাৎপর্য পরে অবশ্য অবগত হয়েছিলাম। শান্তিনিকেতনের সাধারণ ভোজনশালায় প্রতিদিন দু বেলা আহার করেন বিনোদবাবু, আর আমি করি কবির সঙ্গে উত্তরায়ণে,—এই 'এক যাত্রায় পৃথক ফল' নিয়ে তাঁর মনে, অন্তত তার নিশ্চেতন মনে, সম্ভবত একটু ক্ষোভ বর্তমান ছিল। সাধারণ ভোজনশালার সাদামাটা ভোজন ব্যাপারের তুলনায় উত্তরায়ণের চর্ব চোষ্যের ব্যবস্থাকে তিনি হয়তো মনে মনে নিমন্ত্রণের মর্যাদাই দিয়ে থাকেন। তাই, মাথা উঁচু না ক'রে 'জানি' বলার অর্থ—ও আপনার নিত্য নিমন্ত্রণের কথা তো জানাই আছে, আবার নূতন ক'রে সে কথা ব'লে কাটা ঘায়ে নুনের ছিটে দেওয়া কেন!

ভীমরাওজীর গৃহে উপস্থিত হলাম। তিনি আমার জন্য অপেক্ষা করছিলেন, আমাকে দেখেই চায়ের জল চড়াবার আদেশ দিলেন।

ভীমরাও শাস্ত্রী বাঙালী নন; ঠিক মনে পড়েছে না–হয় মহারাষ্ট্রী, নয় গুজরাটী। সঙ্গীতশাস্ত্রে অসাধারণ ব্যুৎপত্তি; সঙ্গীত পরিবেশনে প্রধানত তিনি যন্ত্রী; গাইতেও নিশ্চয়ই পারেন, কিন্তু গান শোনান না,—অন্তত আমাকে সে দিন শোনান নি।

চা-পানের পূর্ব পর্যন্ত নানা বিষয়ে, প্রধানত সঙ্গীত বিষয়ে, আলোচনা চলতে লাগল। চা পানের পর শাস্ত্রী মহাশয় যন্ত্র নিয়ে বসলেন এবং প্রায় ঘণ্টা-তুই সময় আমাকে অতি উৎকৃষ্ট সঙ্গীতের দ্বারা পরিতৃপ্ত করিলেন। রাত্রি আট ঘটিকা উত্তীর্ণ হয়ে গিয়েছিল। ভীমরাওজীকে ধন্যবাদ জানিয়ে প্রভাতবাবুর গৃহের উদ্দেশ্যে গুরুপল্লীর অভিমুখে অগ্রসর হলাম।

প্রত্যাশিত সময় খানিকটা উত্তীর্ণ হয়ে যাওয়ায় প্রভাতবাবু এবং তাঁর স্ত্রী আমার অপেক্ষায় একটু ব্যগ্র হয়ে উঠেছিলেন; আমাকে দেখে তাঁরা নিশ্চিন্ত এবং প্রসন্ন হলেন।

প্রভাতবাবুর স্ত্রীর নামটি আমার মনে পড়ছে না, কিন্তু তাঁর স্নিগ্ধ শান্ত কমনীয় মূর্তি এবং প্রসন্ন-সদয় অভ্যর্থনার কথা আজও ভুলতে পারি নি। আমি উপস্থিত হওয়া মাত্র তিনি চা-পানের প্রস্তাব করলেন, কিন্তু ভীমরাওজীর গৃহের অতি-গুরু চায়ের প্রসঙ্গ তুলে তাঁকে নিবৃত্ত করলাম। বললাম, "আজ ভীমরাওজীর চায়ের অতরল জমাট অংশ নৈশ ভোজের যে ক্ষতি করেছে, প্রয়োজনহীন চায়ের দ্বারা তার মাত্রা আর বাড়াতে চাই নে।"

সেদিন শুধু ভোজন বিষয়েই আমার শুভগ্রহের উদয় হয় নি, সঙ্গীত বিষয়েও হয়েছিল। যন্ত্রসঙ্গীতের দ্বারা পরিতৃপ্ত হয়ে ভীমরাওজীর গৃহ ত্যাগ ক'রে যখন দ্রুতপদে প্রভাতবাবুর গৃহের অভিমুখে অগ্রসর হচ্ছিলাম, তখন কে ভেবেছিল তথায় কণ্ঠসঙ্গীতও আমার জন্যে অপেক্ষা ক'রে আছে! কিন্তু সে কণ্ঠসঙ্গীত তথায় প্রভাতবাবুর কণ্ঠে অপেক্ষা করছিল,

এমন কথা ব'লে কাউকে চমকে দিতে চাই নে। অতিথির শারীর ধর্মে ক্ষুৎপ্রবৃত্তির অভ্যুদয়ের জন্য বেশ-কিছুক্ষণ অপেক্ষা করবার প্রয়োজন মনে হচ্ছিল। সেই অবসরকাল আনন্দের দ্বারা পূর্ণ করবার মানসে গৃহস্বামিনী তাঁর এসরাজটি বার ক'রে রবীন্দ্র-সঙ্গীত শোনাতে বসলেন। গানের পর গান চলতে লাগল। ভারি ভাল লাগছিল। যন্ত্রের সুর বেশি মিষ্ট লাগছিল অথবা কণ্ঠের স্বর, তা ঠিক নির্ণয় করতে পারছিলাম না।

প্রভাতবাবু ও আমি যখন আহারে বসলাম তখন দশটা বাজতে খুব বিলম্ব নেই। সদ্যভাঙা লাল আটার যে রুটির প্রতিশ্রুতির দ্বারা প্রভাতবাবু আমাকে আশ্বস্ত করেছিলেন, আহার-পাত্রে কিন্তু তার সন্ধান পেলাম না। তৎপরিবর্তে পাওয়া গেল সেই খাঁটি আটা ও প্রাক্-দালদা যুগের অভেজাল ঘৃত সহযোগে প্রস্তুত উপাদেয় পুরি। বুঝতে বাকি রইল না, রুটির রুক্ষতা হরণের অভিপ্রায়ে স্নেহময়ী গৃহস্বামিনী আটার সহিত স্নেহ পদার্থের সংযোগ ঘটিয়েছেন। প্রভাতবাবু ও আমি আহার-কার্যে প্রবৃত্ত হলাম, আর প্রভাতবাবুর পত্নী যত্ন ও নির্বন্ধ সহকারে পরিবেশন ক'রে আমাদের খাওয়াতে লাগলেন। বিবিধ উপচারে সমৃদ্ধ দীর্ঘ আহার-ব্যবস্থা শেষ ক'রে আনতে প্রায় সাড়ে দশটা বেজে গেল।

আসন ছেড়ে ওঠবার পূর্বে টিমা লয়ে অলস গল্প-গুজব চলেছে, এমন সময়ে বাইরের নিশ্ছিদ্র নীরবতার মধ্যে ঠিনিন্ ক'রে একটা মৃদু ধাতব শব্দ শোনা গেল। দ্রুতগতি ভরে সাইকেল চ'ড়ে যেতে যেতে অকস্মাৎ ব্রেক ক'ষে নেমে পড়লে গতিনিরোধের ধমকে বেল যেমন সামান্য একটু আওয়াজ ছাড়ে—ঠিক সেই ধরনের শব্দ। তার পরই শোনা গেল মনুষ্যকণ্ঠের মৃদু গুঞ্জন এবং পর-মুহূর্তে প্রভাতবাবুর ভৃত্য প্রবেশ ক'রে আমাকে বললে, "গুরুদেব আপনার জন্যে বিশেষ ব্যস্ত হয়েছেন। দুটি ভদ্রলোক এসে আপনাকে ডাকছেন।"

পৌনে এগারোটার সময়ে গুরুদেব আমার জন্যে ব্যস্ত হয়েছেন! কি ব্যাপার! তাড়াতাড়ি মুখ-হাত ধুয়ে বাইরে গিয়ে দেখি, দুটি সাইকেল নিয়ে দুটি যুবক অপেক্ষা করছে। আমাকে দেখামাত্র একজন লাফিয়ে বাইসিকেলের ওপর উঠে ব'সে দ্রুতবেগে উধাও হ'ল। অপর যুবকও বাইসিকেল বাগিয়ে ধ'রে আমাকে বললে, "গুরুদেব আপনার জন্য অত্যন্ত ব্যস্ত হয়েছেন। যত শীঘ্র সম্ভব আপনি উত্তরায়ণে আসুন।" ব'লে কোনো প্রশ্ন করবার সময় না দিয়ে বাইসিকেলে লাফিয়ে চ'ড়ে ব'সে পূর্বগামী যুবকের মতো উর্ধ্বশ্বাসে বেরিয়ে গেল।

আমার পিছনে পিছনে প্রভাতবাবু এবং তাঁর স্ত্রী বাইরে এসে দাঁড়িয়ে ছিলেন। প্রভাতবাবুর প্রতি দৃষ্টিপাত ক'রে বিস্মিত কণ্ঠে জিজ্ঞাসা করলাম, "কি ব্যাপার বলুন দেখি?"

প্রভাতবাবু বললেন, "কিছু তো বুঝতে পারছি নে। হয়তো আপনাকে বলবার মতো কোনো কথা হঠাৎ মনে হয়েছে, তাই আপনার জন্যে ব্যস্ত হয়ে পড়েছেন।"

প্রভাতবাবু ও তাঁর স্ত্রীর কাছে বিদায় নিয়ে দ্রুতপদে উত্তরায়ণের অভিমুখে অগ্রসর হলাম। পথে গেস্ট হাউস পড়ে; মনে করলাম একবার বিনোদবাবুর সঙ্গে দেখা ক'রে যাই, যদি তাঁর কাছে কোনও হদিস পাওয়া যায়।

আপিসে বিনোদবাবুর আমি ওপরওয়ালা, সব সময়ে তিনি আমার সঙ্গে সম্ভ্রমের সহিত কথা কন; আমাকে দেখা মাত্র কিন্তু অগ্নিশর্মা হয়ে উঠে প্রায় ধমক দিয়ে বললেন, "কোথায় ছিলেন আপনি? গুরুদেব তিনবার আপনার সন্ধানে লোক পাঠিয়েছিলেন। একটু আগে রথিবাবু নিজে এসেছিলেন।"

বিমূঢ় কণ্ঠে জিজ্ঞাসা করলাম, "কি দরকার, তা কিছু বলেছিলেন তিনি ?"

দক্ষিণ হস্তের তিনটি আঙুল দেখিয়ে চক্ষু গোল গোল ক'রে বিনোদবাবু উচ্চৈঃস্বরে বললেন, "হ্যাঁ, তিনবার। তিন-তিনবার লোক পাঠিয়েছিলেন।"

কি বিপদেই না পড়া গেছে! এর চেয়ে নিজের কান খাটো হওয়া ভাল। আর বৃথা সময় নষ্ট না ক'রে তাড়াতাড়ি বেরিয়ে পড়লাম উত্তরায়ণের পথে।

পিছন দিক থেকে বিনোদবাবু হাঁক দিয়ে বললেন, "আর কোথাও দেরি করবেন না যেন।"

উপদেশ শুনে পিত্তি জ'লে উঠল। বাগে পেয়ে একেবারে মুরুব্বি হয়ে বসেছেন! ভাবলাম, খানিকটা ফিরে এসে বলি, "যে আজ্ঞে।" কিন্তু কোনো সুফল হবে না তাতে; হয়তো আর একবার ধান শুনতে গান শোনবার সুযোগ দেওয়া হবে।

উত্তরায়ণের সম্মুখে উপস্থিত হয়ে দেখি, পথে রথিবাবু পায়চারি করছেন, বুঝতে পারলাম আমারই প্রতীক্ষায়। মুখে তাঁর মৃদুমধুর হাসি। আমি নিকটে যেতে বললেন, "উঃ! উপেনবাবু, আজ আপনার জন্যে সারা শান্তিনিকেতনে ঘণ্টা-দুই ধ'রে তোলপাড় হয়েছে। কি কাণ্ডই যে আপনি আজ বাধিয়েছিলেন!"

উগ্র ঔৎসুক্যের সহিত বললাম, "কেন বলুন দেখি ?"

রথিবাবু বললেন, "বাবা মশায় আপনার জন্যে অপেক্ষা করছেন। ঘরে যান, তাঁর মুখেই সব শুনবেন।"

ঘরে অবশ্য তখনই গেলাম। কিন্তু ঘরের কথা বলবার আগে, যে ব্যাপারটা শান্তিনিকেতনকে তোলপাড় করেছিল এবং যার বিবরণ তখনই

আমি রথিবাবুর মুখে সংক্ষেপে এবং পরে বিস্তারিতভাবে অপরাপর লোকের মুখে শুনেছিলাম, তা বিবৃত করলে ঘরের ভিতরের এই কাহিনীর শেষ অঙ্ক, তার কৌতুক এবং করুণতা নিয়ে যথার্থ মহিমায় প্রকাশ পেতে পারবে।

প্রতিদিন সন্ধ্যার খানিকটা পরে আমি উত্তরায়ণে যেতাম, আর ফিরতাম নৈশ আহার সেরে রাত নটা দশটার সময়ে। সেদিন হঠাৎ কোনো কারণে তাড়াতাড়ি আমার দরকার পড়ায় কবি লোক পাঠান গেস্ট হাউসে। কিন্তু ঠিক তার কিছু পূর্বে আমি ভীমরাও শাস্ত্রীর বাড়ি রওনা হয়েছি। রওনা হবার পূর্বে আমি যে বিনোদবাবুকে ব'লেছিলাম— রাত্রে আমার নিমন্ত্রণ আছে, যার উত্তরে তিনি বলেছিলেন 'জানি', সেই ভুল ধারণার বশবর্তী হয়ে বিনোদবাবু অনর্থের সূত্রপাত করেছেন,—রবীন্দ্র-নাথের লোককে বলেছেন, গাঙুলী। মশায় গুরুদেবের বাড়িই গেছেন।

লোকের মুখে সে কথা শুনে রবীন্দ্রনাথ মনে করেন, হয়তো আমি কোথাও ঘুরে-ঘারে আসছি ব'লে কিছু বিলম্ব হচ্ছে। আধ ঘণ্টাটাক অপেক্ষা ক'রে পুনরায় তিনি গেস্ট হাউসে লোক পাঠান। পুনরায় লোক একই সংবাদ নিয়ে ফেরে, "না, সেই যে তিনি উত্তরায়ণে যাচ্ছেন ব'লে বেরিয়েছেন, তার পর আর গেস্ট হাউসে ফেরেন নি।"

রাত্রি আটটার সময়ে তৃতীয় বার গেস্ট হাউসে লোক পাঠিয়ে যখন আমার কোনো সন্ধান পাওয়া গেল না, তখন রবীন্দ্রনাথের মনের ক্রমবর্ধমান দুশ্চিন্তা বোধ করি চরমে পৌঁছেছে ; মনে হয়েছে, কয়েক দিন আগে যে ব্যক্তি নালায় পড়েছিল, আজ হয়তো বা সে একেবারে কুয়ার মধ্যেই প্রবেশ করেছে। এমন কথা মনে করা খুব অসঙ্গতও নয়। শান্তিনিকেতনের মাঠে কয়েক স্থানে কূপের মতো কয়েকটা গভীর গর্ত

ছিল, যার না ছিল আচ্ছাদন, না ছিল বেড়া। সন্ধ্যার অন্ধকারে অজানা লোকের পক্ষে তার মধ্যে গিয়ে পড়া এমন কিছু অসম্ভব কথা নয়।

এইরূপ নানাপ্রকার দুশ্চিন্তায় অধীর হয়ে রবীন্দ্রনাথ তখন কয়েক জনকে দিকে দিকে পাঠিয়েছেন আমার সন্ধানে। আমি হয়তো তখন ভীমরাও শাস্ত্রীর পালা শেষ ক'রে নিশ্চিন্ত পরিতৃপ্ত মনে চলেছি প্রভাতবাবুর বাড়ি উৎফুল্ল প্রত্যাশায়। এ দিকে দুশ্চিন্তাদহমান রবীন্দ্রনাথের পক্ষে ব'সে থাকা সম্ভব হচ্ছে না; উত্তেজিতভাবে তিনি পায়চারি করছেন আর ভাবছেন, এই ক্ষুদ্র স্থান শান্তিনিকেতন—এখানে না আছে থিয়েটার-সিনেমা, না আছে ক্লাব অথবা রেস্তরাঁ,—এমন কি আত্মীয়-পরিজন পর্যন্ত নেই, এখানে অমন জোয়ান মদ্দ লোকটা একেবারে বেমালুম গায়েব হয়ে গেল! চিঠি লিখে নিমন্ত্রণ ক'রে শান্তিনিকেতনে আনিয়ে শেষ পর্যন্ত কলকাতায় ফেরত পাঠানো যাবে না নাকি! সময়ের অগ্রগতির সঙ্গে দুশ্চিন্তার প্রাচুর্য এবং পায়চারির গতিবেগ একই মাত্রায় বেড়ে চলেছে। মাঝে মাঝে সন্ধানকারীদের প্রত্যাবর্তন-পথে তাকাচ্ছেন, আর মনের চিন্তার চাপ বাড়াচ্ছেন। কিছুক্ষণের মধ্যে একে একে অনুসন্ধানকারীগণ সকলেই ফিরে এল, কিন্তু কেউ নূতন কথা নিয়ে ফিরতে পারলে না, সকলের মুখে এই সংবাদ—কোথাও তাঁকে খুঁজে পাওয়া গেল না।

তখন সহসা রবীন্দ্রনাথ অগ্নিমূর্তি ধারণ করলেন; আরক্ত মুখে প্রজ্বলিত নেত্রে প্রখর কণ্ঠে বললেন, "তোমরা অপদার্থ! গেস্ট হাউস থেকে উত্তরায়ণ তিন মিনিটের পথ, একটা লোক তিন ঘণ্টায় শেষ করতে পারলে না, তাকে সাপে খেলে, না, বাঘে খেলে, সে খানায় পড়ল, না, কুয়োয় পড়ল—কিছুই তোমরা বার করতে পারলে না!" তার পর সহসা কণ্ঠস্বর চতুর্গুণ চড়িয়ে নিয়ে চিৎকার ক'রে উঠলেন, "তার লাশ নিয়ে এসো। আমি তার লাশ দেখতে চাই।"

শুনে সকলে তো একেবারে তটস্থ! 'লাশ নিয়ে এসো' একেবারে চরম বাক্য, এর চেয়ে বড় ক'রে আর কিছু দাবি করা চলে না,—মরার বাড়া গাল নেই।

তখন লণ্ঠন আর লাঠি নিয়ে নূতন সন্ধানকারীর দল বেরিয়ে পড়েছে। পথে-মাঠে ঝোপে-ঝাড়ে তারা অন্বেষণ ক'রে ফিরছে; হয়তো 'উপেনবাবু আছেন? উপেনবাবু আছেন?' রবে শান্তিনিকেতনের স্তব্ধ আকাশকে কাতর ক'রে তুলছে।

এত প্রচেষ্টাতেও কোনো ফল না হওয়ায় অবশেষে দূরের দিকে মনোযোগ আকৃষ্ট হয়েছে। সাইকেল নিয়ে শ্রীনিকেতন অথবা ভুবনডাঙার দিকে কেউ গিয়েছিল কি না মনে পড়ছে না, কিন্তু যে দুটি যুবক গুরুপল্লীর দিকে গিয়েছিল, শান্তিনিকেতন পল্লীগ্রামের পক্ষে সাড়ে দশটার মতো রাত্রে প্রভাত মুখোপাধ্যায়ের গৃহে আলো জ্বলতে দেখে আশান্বিত হয়ে তারা ব্রেক ক'ষে নেমে পড়ে। তাদেরই সাইকেলের ঠিনিন্‌ শব্দের কথা পূর্বেই বলেছি।

আমাকে দেখেই প্রথম যুবকটি সাইকেলে চ'ড়ে নক্ষত্রবেগে উত্তরায়ণে উপস্থিত হয়ে সংবাদ দেয়, আমি শুধু বেঁচেই নেই, প্রভাতকুমারের গৃহে বহাল তবিয়তেই বর্তমান আছি।

প্রভাতকুমারের গৃহের উল্লেখে রবীন্দ্রনাথের তৎক্ষণাৎ সকালবেলাকার আমার নিমন্ত্রণের কথা মনে পড়ে এবং বুঝতে পারেন, এর পরও তাঁর রেগে থাকতে হ'লে প্রধানত নিজের উপরেই থাকতে হয়। কিন্তু রাগ এমন-এক জিনিস যে, তার কারণ অপসৃত হ'লেও মনটা ক্ষণকাল বিক্ষুব্ধ হয়ে থাকে,—ঝড় থেমে গেলেও যেমন সমুদ্রের আলোড়ন সহসা থামতে চায় না।

রথিবাবু বললেন, "আপনি আর দেরি করবেন না উপেনবাবু, বাবামশায় এখনও খান নি।"

বিস্মিত হয়ে বললাম, "এগারোটা বাজে, খান নি এখনও? কেন বলুন তো?"

সহাস্যমুখে রথিবাবু বললেন, "আপনার সঙ্গে খাবার জন্যে অপেক্ষা ক'রে আছেন।"

"কিন্তু প্রভাতবাবুর বাড়িতে আজ রাত্রে আমার খাবার নিমন্ত্রণ—সে কথা তো উনি জানেন।"

"তাই নিয়েই তো যত হাঙ্গামার সৃষ্টি।" ব'লে রথিবাবু অতি সংক্ষেপে মাত্র রহস্যটুকুর বিবৃতি দিলেন।

ঘরে প্রবেশ ক'রে দেখি, চেয়ারের উপরে রবীন্দ্রনাথ গম্ভীর মুখে ব'সে আছেন, তাঁর সম্মুখে টেবিলের উপর তাঁর অভুক্ত খাদ্যসম্ভার। টেবিলের অপর দিকে সামনাসামনি আর একপ্রস্থ খাদ্যের আয়োজন। অদূরে ঘরের কোণে দাঁড়িয়ে আছেন রবীন্দ্রনাথের পুত্রবধূ শ্রীমতী প্রতিমা এবং অমিয় চক্রবর্তীর পত্নী শ্রীমতী হৈমন্তী। মুখে তাঁদের চাপা হাসি। অপরাধীর প্রতি কি দণ্ডবিধান হয় দেখবার জন্য উভয়ে কৌতুক ও কৌতূহল-উদ্বেলিত চিত্তে অপেক্ষা করছেন।

মুখ তুলে আমার প্রতি দৃষ্টিপাত ক'রে রবীন্দ্রনাথ বললেন, "নাও, ব'স। খাও।"

বললাম, "অপরাধ হয়তো কিছু করেছি, কিন্তু প্রভাতবাবুর বাড়ি খেয়ে এসে এখানে আবার এ সব খেলে লঘু পাপে গুরুদণ্ড হবে।"

"তবে যতক্ষণ আমার খাওয়া শেষ না হয়, এখানে ব'স।"

"সানন্দে।" ব'লে চেয়ারে উপবেশন করলাম।

* * * * *

সে রাত্রে গেস্ট হাউসে যখন ফিরলাম তখন বারোটা বাজে।

যত দূর মনে পড়ছে, ১৩৩৮ সালের অগ্রহায়ণ কিংবা পৌষ মাসের কথা। তখন 'বিচিত্রা'র কার্যালয় শ্যামবাজারে যদুনাথ মিত্র লেনে অবস্থিত।

সন্ধ্যা সাতটা সাড়ে সাতটা। আপিস অনেকক্ষণ বন্ধ হয়েছে; কর্মচারীগণ নিজ নিজ দপ্তর বন্ধ ক'রে প্রস্থান করেছেন; শুধু সুশীল মিত্রের আসনে সুশীল এবং আমার আসনে আমি অধিষ্ঠিত থেকে নিজ নিজ কার্যে রত আছি। এ কথা মনে না করিয়ে দিলেও চলে, সুশীল মিত্র 'বিচিত্রা'র পরিচালক আর আমি সম্পাদক। সুশীলের আসন আর আমার আসনের মধ্যে হাত চারেকের ব্যবধান।

টেলিফোন বেজে উঠল—ক্রিরিরিং।

রিসিভার তুলে নিয়ে জিজ্ঞাসা করলাম, "হ্যালো!"

উত্তর এল, "কে, উপীন না-কি?"

সেই অতিপরিচিত কণ্ঠস্বর, যার তরঙ্গপ্রবাহ গত পাঁচ-ছয় বৎসর শ্রবণ-পথে প্রবেশ করে নি।

বললাম, "হ্যাঁ। কেমন আছ শরৎ?"

"অমনি এক রকম। তোমাদের কাগজের অবস্থা না-কি ভারি খারাপ?"

বললাম, "কোন্ হিসেবে বলছ?"

"আর্থিক হিসেবে।"

বললাম, "ও অতিশয় জটিল কথা,—'ভারি খারাপ' কি না, ফস্ ক'রে বলা যায় না; তবে ভাল নয়, তা বলতে পারি।"

"আমার লেখা পেলে তোমাদের স্থবিধে হয় ?"

বললাম, "হওয়া তো উচিত।"

"চাও ?"

চাকা তা হ'লে ঘুরল ! পাঁচ-ছ বৎসর পূর্বে একদিন শরতের লেখা চাইতে গিয়ে দুঃখ ও অপমানের যে দুর্বিষহ গ্লানি নিয়ে অভুক্ত পিপাসার্ত অবস্থায় সামতাবেড় থেকে ফিরেছিলাম, সে কথা মনে প'ড়ে একটা দুর্বার উল্লাস ও অভিমানের মিশ্র রসায়নের উত্তেজনায় মনটা চনমনিয়ে উঠল। বোধ করি প্রধানত সেই অবস্থা সামলে নেবার জন্যেই একটু সময় নেবার উদ্দেশ্যে বললাম, "এক মুহূর্ত অপেক্ষা কর, সুশীল কি বলছে শুনি।"

আমার কথার মধ্যে শরতের নাম শুনে পর্যন্ত সুশীল ব্যগ্র হয়ে নিম্ন কণ্ঠে পুনঃ পুনঃ আমাকে জিজ্ঞাসা করছিল, "কি ব্যাপার উপেনদা, কি ব্যাপার ?" হাত দিয়ে রিসিভারটা একটু চাপা দিয়ে সুশীলের দিকে অল্প ঝুঁকে মৃদুস্বরে বললাম, "শরৎ চাটুজ্জে।"

সুশীল বললে, "তা তো বুঝেছি। কি বলছেন উনি ?"

"বলছে, লেখা দিতে চায়। নেবে ?"

সুশীলের মুখ উজ্জ্বল হয়ে উঠল ; বললে, "এ আবার জিজ্ঞেস করছ কি ? নিশ্চয়ই নোব।"

এই সময়টুকুর মধ্যে মনের সহসা-উদ্দীপ্ত উত্তেজনা অনেকটা উপশান্ত হয়ে এসেছিল। তা ছাড়া, 'বিচিত্রা'র পাঠক এবং গ্রাহকবর্গের নিকট শরৎচন্দ্রের লেখা প্রাপণীয় হয়েছে, আমি আমার ব্যক্তিগত মান-অভিমানের প্রসঙ্গ নিয়ে তদ্বিষয়ে প্রতিবন্ধক হই কেন ? রিসিভার থেকে হাত সরিয়ে নিয়ে শরৎকে বললাম, "চাই কি-না জিজ্ঞাসা করছ কেন শরৎ ? আমি তো চাইতেই গিয়েছিলাম, তুমিই দিয়েছিলে ফিরিয়ে।"

এ অনুযোগের অথবা অভিমানের কোনো উত্তর না দিয়ে শরৎ বললে, "কতক্ষণ আছ আপিসে?"

প্রশ্নের ভাষার ফাঁকে ফাঁকে যে অর্থ, তা বুঝতে বাকি রইল না; বললাম, "আসছ নাকি তুমি?"

"আসছি। তোমাদের আপিসের জায়গাটা একটু ভাল ক'রে বুঝিয়ে দাও তো উপীন।"

জিজ্ঞাসা করলাম, "কোথা থেকে বলছ?"

শরৎ উত্তর দিলে, "হরিদাসের দোকান থেকে।"

হরিদাস অর্থাৎ গুরুদাস চট্টোপাধ্যায় অ্যাণ্ড সন্সের বিখ্যাত পুস্তকালয়ের অন্যতম স্বত্বাধিকারী হরিদাস চট্টোপাধ্যায়। তা হ'লে তো কাছেই। হরিদাসবাবুর দোকান থেকে আমাদের আপিসে আসার পথ-সঙ্কেত সুস্পষ্টভাবে শরৎকে বুঝিয়ে দিলাম।

শরৎ বললে, "মিনিট দশেকের মধ্যে পৌঁছচ্ছি।"

কার্যকালে বোধ করি দশ মিনিটও লাগল না, মিনিট আষ্টেকের মধ্যে আমাদের বেয়ারা রঘুর সহিত প্রসন্নস্মিত মুখে শরৎ আমাদের কক্ষে প্রবেশ করলে। শরতের প্রত্যাশায় আমরা রঘুকে সদর-দরজায় মোতায়েন্ রেখেছিলাম।

শরৎকে আমরা সহজ সমাদরের সহিত গ্রহণ করলাম, এবং শরৎও আমাদের মধ্যে এসে ব'সে সহজ সুরেই কথাবার্তা আরম্ভ করলে। কোনো পক্ষই অসুবিধাজনক পূর্ব-প্রসঙ্গের বিন্দুমাত্রও উল্লেখ করলে না,—সুতরাং তৎসংক্রান্ত অনুযোগ-অভিযোগ, কৈফিয়ৎ তলব অথবা ক্ষমা প্রার্থনা—কোন্-কিছুরই প্রশ্ন রইল না। জোড় লাগল; আর এমন ভাবেই লাগল যে, কোনোদিন যে কোথাও একটু চিড় খেয়েছিল, তার চিহ্নমাত্র রাখলে না। যাকে বলে—বেদাগ জোড়, একেবারে তাই।

ভুল ধারণাকে আশ্রয় ক'রে যখন কোনো গোলযোগ গ'ড়ে ওঠে, ভুল ভাঙার পর সে গোলযোগ এমনি ক'রেই ভেঙে যায়।

দু-চার মিনিটের সাধারণ কথাবার্তার পর আসল কথা উঠল। শরৎ জিজ্ঞাসা করলে, "কি চাও আমার কাছ থেকে উপীন?"

বললাম, "উপন্যাস নিশ্চয়ই।"

শরৎ বললে, "উপন্যাস তো নিশ্চয়ই।—কোন্ বিষয়ে উপন্যাস, তাই জিজ্ঞাসা করছি।"

টেলিফোন ছাড়ার পরই মনে মনে সে কথা ঠিক ক'রে রেখেছিলাম; বললাম, "'শ্রীকান্ত চতুর্থ পর্ব'।"

বিস্মিত কণ্ঠে শরৎ বললে, "বল কি! 'শ্রীকান্ত চতুর্থ প'র্ব? তিন পর্বের পর আবার চতুর্থ পর্ব পড়বার ধৈর্য থাকবে পাঠকদের?"

বললাম, "নিশ্চয়ই থাকবে। 'শ্রীকান্ত তৃতীয় পর্ব'র শেষে তুমি রাজলক্ষ্মীকে কাশীধামে সদ্‌গুরুর হস্তে সমর্পণ ক'রে তার আখ্যায়িকায় চিরদিনের মতো যবনিকা ফেলেছ কি-না তা জানি নে। আর, এর পর আবার রাজলক্ষ্মী আর শ্রীকান্তকে রাঙামাটিতে ফিরিয়ে নিয়ে গিয়ে গল্প বলতে আরম্ভ করলে পাঠকেরা ধৈর্য হারাবে কি-না, সে কথা বলাও কঠিন। কিন্তু যে অভয়ার সজোর আমন্ত্রণে শ্রীকান্ত সাগ্রহে রেঙ্গুন যেতে উদ্যত হয়েছে, সে অভয়াকে তুমি কুঁড়ি রেখেই নিরস্ত হয়েছ, ফুল ক'রে ফোটাও নি। কিন্তু কুঁড়ি অবস্থাতেই অভয়া যে সুমিষ্ট সৌরভের পরিচয় দিয়েছে, তার ফুল হয়ে ফোটার কাহিনী যদি বিবৃত কর, আমার বিশ্বাস, সে অপূর্ব কাহিনীর সুধা, শুধু 'বিচিত্রা'র পাঠকবর্গই নয়, আপামর গৌড়জন আনন্দে পান করবে।"

সুশীল আমার এ প্রস্তাব সজোরে সমর্থিত করলে; শরৎচন্দ্রও কতকটা প্রলুব্ধ হয়ে সম্মতি জানালে। এমন কি, 'বিচিত্রা'র পরিবর্তী সংখ্যায় এই

মর্মে বিজ্ঞাপন প্রকাশিত হ'ল যে, ১৩৩৮ সালের মাঘ সংখ্যা থেকে 'বিচিত্রা'য় ধারাবাহিকভাবে শরৎচন্দ্রের 'শ্রীকান্ত চতুর্থ পর্ব' প্রকাশিত হবে এবং তার মধ্যে পাওয়া যাবে, যে অভয়া-কোরকের সুমিষ্ট সৌরভে 'শ্রীকান্ত'-পাঠকের মন বিভোর হয়ে আছে, তার ফুল হয়ে ফুটে ওঠার অপূর্ব কাহিনী।

বিজ্ঞাপিত সময়ে 'বিচিত্রা'য় 'শ্রীকান্ত চতুর্থ পর্ব' প্রকাশিত হ'ল বটে, কিন্তু তার মধ্যে অভয়ার কোনো সন্ধান পাওয়া গেল না; কবি জহর এবং বৈষ্ণবী কমললতাকে অবলম্বন ক'রে চতুর্থ পর্বের কাহিনী অগ্রসর হ'ল। লেখা আরম্ভ করবার সময়ে শরৎ মত পরিবর্তন করেছিল। বাংলা-সা।হত্যে অভয়া চিরদিনের মতো অর্ধকথিতা হয়েই রইল।

'বিচিত্রা'র ১৩৩৯ সালের মাঘ সংখ্যায় 'শ্রীকান্ত চতুর্থ পর্ব' শেষ হয়ে গেল। পরবর্তী সংখ্যা থেকেই আরম্ভ হ'ল 'বিচিত্রা'য় শরৎচন্দ্রের দ্বিতীয় উপন্যাস 'বিপ্রদাস'—চলল ১৩৪১ সালের মাঘ মাস পর্যন্ত। 'বিপ্রদাসে'র পরও শরৎচন্দ্র 'বিচিত্রা'য় আর একটি উপন্যাস আরম্ভ করেছিলেন, কিন্তু দেহের মধ্যে মারাত্মক ব্যাধির আবির্ভাববশত সে উপন্যাস বেশি দূর অগ্রসর হতে পারে নি।

প্রথম দিনের বৈঠকেই শরৎচন্দ্রের সঙ্গে তার দক্ষিণার হার ঠিক ক'রে নিলাম। জিজ্ঞাসা করলাম, "মাসে মাসে তোমাকে কত টাকা দিতে হবে শরৎ?"

মনে মনে একটু চিন্তা ক'রে শরৎ বললে, "'যোগাযোগে'র জন্যে রবীন্দ্রনাথকে কি রকম দিতে?"

বললাম, "তাঁকে মাসিক হারে দিতাম না; একেবারে সম্পূর্ণ উপন্যাসের দক্ষিণা বাবত দিয়েছিলাম তিন হাজার টাকা। মাসিক পড়তা বোধ হয় এক শো টাকা ক'রে দাঁড়িয়েছিল।"

"আমাকে কত দেবে ?"

"পঞ্চাশ টাকা।"

ঘাড় নেড়ে শরৎ বললে, "আচ্ছা, তাই দিয়ো।"

যে ভুল ধারণার বশবর্তী হয়ে শরৎচন্দ্র আমাকে লেখা দিতে অসম্মত হয়েছিলেন এবং 'বিচিত্রা'র স্বত্বাধিকারী সুশীলকুমার মুখোপাধ্যায়কে কয়লাওয়ালার ছেলে ব'লে অভিহিত করেছিলেন, কৌতূহলী পাঠকের কৌতূহল নিবারণার্থে তদ্বিষয়ে সামান্য কিছু বলা দরকার।

যে সময়ে আমি লেখার জন্য সামতাবেড়ে শরৎচন্দ্রের নিকট উপস্থিত হয়েছিলাম, তার কিছুকাল পূর্বে, সম্ভবত হাওড়া মিউনিসিপ্যালিটির কোনও পদ নিয়েই দুই পরাক্রান্ত প্রতিদ্বন্দ্বীর মধ্যে একটা যৎপরোনাস্তি উত্তেজনাপূর্ণ নির্বাচন-ব্যাপার অনুষ্ঠিত হয়েছিল। প্রতিদ্বন্দ্বীদের মধ্যে এক পক্ষ ছিলেন হাওড়া মিউনিসিপ্যালিটির তদানীন্তন ভাইস-চেয়ারম্যান শ্রীযুক্ত নিত্যধন মুখোপাধ্যায় ; দ্বিতীয় পক্ষে কে ছিলেন তা আমার জানা নেই। নির্বাচন-ব্যাপারে শরৎচন্দ্র দ্বিতীয় পক্ষকে বিধিমতে সাহায্য করছিলেন ; এবং নিত্যধনবাবুর সাহায্যে আড়ে-হাতে লেগেছিলেন তাঁর পরম বন্ধু যোগীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়।

এই যোগীন্দ্রনাথ সুশীলকুমারের পিতা, অর্থাৎ আমার বৈবাহিক ; সুতরাং যতই দূরবর্তী হোন না কেন, শরৎচন্দ্রের কুটুম্ব। আমাকে ভাগলপুর থেকে আনিয়ে নিয়ে এই কুটুম্বিতার জোরে নিত্যধনবাবু যদি শরৎচন্দ্রকে নিজের দিকে ভাঙিয়ে নেবার, অন্তত দ্বিতীয় পক্ষ সম্পর্কে নিরস্ত করবার চেষ্টা করেন, তা হ'লে দ্বিতীয় পক্ষের পক্ষে একটা গুরুতর বিপদের সম্ভাবনা। যোগীন্দ্রনাথের বিরুদ্ধে শরৎচন্দ্রের মনকে বিষিয়ে রাখতে পারলে এই বিপদ থেকে মুক্তি লাভের কতকটা উপায় হয়। বোধ করি দ্বিতীয় পক্ষকে প্রসন্ন করবার উদ্দেশ্যে এবং যোগীন্দ্রনাথের

ঋণ পরিশোধের অভিপ্রায়ে এই কার্যের ভার গ্রহণ করেন এমন এক ব্যক্তি, যিনি এক সময়ে যোগীন্দ্রনাথের দ্বারা প্রচুর পরিমাণে উপকৃত হয়েছিলেন। তিনি শরৎচন্দ্রের শ্রবণবিবরে উগ্র হলাহল ঢেলে দিয়ে একেবারে খেপিয়ে দিলেন, যার ফলে কয়লা-খনির মালিক হয়ে গেলেন কয়লাওয়ালা।

আর সত্যিই তো প্রতিদিন যোগীন্দ্রবাবুর গৃহে নৈশ ভোজের টেবিলে ভোজনরত অতিথিবর্গকে খাদ্যের সঙ্গে কৌতুক এবং আনন্দ পরিবেশন করবার উদ্দেশ্যে কোনো মামাতো ভগ্নী যদি পিসতুতো দাদার বিরুদ্ধে কদর্য কুৎসা রটিয়ে বেড়ায়, তা হ'লে বরদাস্তই বা করা যায় কি ক'রে! তা ছাড়া, প্রতিভাবান ব্যক্তি মাত্রেই একটু কান-পাতলা হয়।

পাঁচ-ছয় বৎসর পরে কিন্তু একদিন ধর্মের কল বাতাসে নড়ল। কথায় কথায় জানতে পেরে শরতের একজন বন্ধু, যাঁর সততা এবং সত্যবাদিতার প্রতি শরতের অবিচল আস্থা ছিল, উত্তেজিত কণ্ঠে বলেছিলেন, "আরে! ঐ মতলববাজ নোংরা লোকটার মিথ্যে কথা বিশ্বাস ক'রে তুমি এতকাল ভ্রান্ত হয়ে রয়েছ! স্বদেশী জেল থেকে মুক্তিলাভের দাবিতে ও যোগীন মুখুজ্জের আপিসে চাকরি পেয়েছিল। যোগীনবাবুর অন্দর-মহলে ওর কোনোদিন প্রবেশ ছিল না। আর ছিল না যোগীনবাবুর বাড়িতে কোনোদিন ডিনার টেবিলের রেওয়াজ। যোগীনবাবুর পুত্রবধূ অতিশয় শান্ত লাজুক মেয়ে; ভাল ক'রে পরিচয় যদি হয়, বুঝতে পারবে।"

দিন কয়েক আগে আমার খুড়তুতো ভাই সুপ্রসিদ্ধ সাহিত্যিক সুরেনদাদার মুখে অবগত হয়েছিলাম, এই সংবাদ পেয়ে পর্যন্ত শরৎ যৎপরোনাস্তি দুঃখিত এবং অনুতপ্ত হয়ে আছে।

কিছু পূর্বে বেদাগ জোড়ের কথা বলেছি। জোড়টা শেষ পর্যন্ত

এমন বেদাগ লাগল যে, কালক্রমে দেখা গেল, শরৎচন্দ্র ও সুশীলের মধ্যে একটি প্রগাঢ় শ্রদ্ধা ও স্নেহের সম্পর্ক গ'ড়ে উঠেছে। সুশীলের তখন দমদমে এরোড্রোমের অব্যবহিত উত্তরে উনিশ বিঘা জমির উপর সুরম্য অট্টালিকা। বিজলীবাতি ও ড্রেনের খাস নিজের ব্যবস্থা—সুবৃহৎ পোল্ট্রি, সুনির্মিত গোশালা। কম্পাউণ্ডের পূর্বদিকের ইমারতের দক্ষিণ পার্শ্বে সুবৃহৎ পুষ্করিণী, তার চতুর্দিকে লালদীঘির মতো পাকা আলিসা দিয়ে ঘেরা, পুকুরের পশ্চিম পাড়ের মধ্যস্থলে জমানো কংক্রীটের সুদৃশ্য চাঁদনি।

শরৎচন্দ্র বলেন, "সুশীল, তোমার এ জায়গাটি যেমন খোলা তেমনি মনোরম! তোমার বাড়ির কাছাকাছি আমার জন্যে একটু জমির ব্যবস্থা ক'রে দিয়ো,—আমি এখানে বাড়ি ক'রে বাস করব।"

সুশীল কিছু বলেন না, সম্মতিসূচকভাবে নিঃশব্দে হাসেন।

সুশীলের কম্পাউণ্ডে নানা প্রকারের ফুলগাছ। পুকুরের ধারে ধারে রক্ত গোলাপী সাদা নীল—কয়েক রঙের জবাগাছ। সুশীল শরৎকে ভাল ভাল ফুলগাছের চারা পাঠান; শরৎ সযত্নে সেগুলি নিজের জমিতে রোপিত করেন।

রবিবাসরের বার্ষিক উৎসব এবং বিশেষ বিশেষ অধিবেশন সুশীলের দমদমার গৃহে হয়। রবিবাসরের সর্বাধ্যক্ষ জলধর সেন বলেন, "সুশীল, শুধু নামেই তোমার বাড়ি 'অলকা' নয়, গুণেও অলকা। এ বাড়ির মা-লক্ষ্মী যখন উপেনের কন্যা, তখন আমাদেরও কন্যা। ইচ্ছামতো 'অলকা'য় সভা করবার অধিকার আমাদের রইল।"

সহাস্য মুখে সুশীল বলেন, "নিশ্চয়ই রইল।"

রবিবাসর থেকে শরৎচন্দ্রকে সম্বর্ধনা দেওয়া হচ্ছে। সভা বসেছে 'অলকা'য়—ইমারতের পূর্বদিকের উন্মুক্ত আকাশতলে ঘন হরিৎবর্ণের তৃণাস্তরণের উপর। বিস্তৃত সভাতলকে খচিত করেছে সুপরিকল্পনায়

সজ্জিত ছোট ছোট টেবিল, চতুর্দিকে চেয়ারে বেষ্টিত হয়ে। সভার এক দিকে গান-বাজনার আসরে সমারোহের সহিত গান-বাজনা চলেছে, এমন সময় অকস্মাৎ দক্ষিণ দিকের এরোড্রোম থেকে একটা এরোপ্লেন উড়ে এসে প্রথমে আমাদের মাথার উপর গোটা তিন-চার চক্র দিলে, তার পর সহসা উল্টে-পাল্টে এঁকে-বেঁকে কখনো উপরে উঠে, কখনো হু-হু ক'রে নীচে নেমে, কখনো তির্যকগতি অবলম্বন ক'রে নানা প্রকার কসরৎ দেখাতে লাগল। পরম কৌতুক এবং আনন্দের সহিত আমরা এই দৈবাৎলব্ধ প্রীণন উপভোগ করতে লাগলাম। আমাদের মধ্যে দু-চারজন 'দৈবের কথা বলা যায় কি কখনো'-মনোভাবের সতর্ক মানুষ ছিলেন, তাঁরা বারান্দায় উঠে বসলেন।

মিনিট তিন-চার এই ভাবে খেলা দেখিয়ে প্লেনটি তার আশ্রয়ভূমির অভিমুখে চ'লে গেল। আমাদের উৎসব-আয়োজনে এইভাবে শরিক হয়ে প্রতিবেশীজনোচিত সহৃদয়তা প্রদর্শনের জন্য আকাশচারীকে আমরা মনে মনে ধন্যবাদ জানালাম।

এই শরৎ-সম্বর্ধনা উপলক্ষে সভায় গীত হবার উদ্দেশ্যে আমি একটি গান রচিত করেছিলাম। মৃত্যুপথযাত্রী অবস্থায় শরৎচন্দ্র একদিন স্বেচ্ছাপ্রবৃত্ত হয়ে গানটি পুনরায় আমার মুখে শুনেছিলেন। গানটি এখানে উদ্ধৃত করলে বোধ করি অসঙ্গত হবে না।—

নন্দিত তুমি শরৎচন্দ্র,
বন্দিত তুমি হে রূপকার!
মানব মনের গহন বনের
হে মহাসাধক কল্পনার!
চিত্ত-কাননে শেফালী করবী
অপরূপ রূপে ফুটাইলে কবি,

নিকষ-নিবিড় তিমির গগনে
বিরচিলে ছবি চন্দ্রমার !
পঙ্কের মাঝে যে ছিল মলিন
করিলে তাহারে পঙ্কজিনী,
তোমার প্রভায় পাপ-মেঘ গায়ে
জাগিল সুপ্ত সৌদামিনী !
হে মরমী সখা, বন্ধু সুজন,
লহ হে মোদের এ প্রীতি-পূজন,
লহ প্রণয়ের মিলিত মনের
রবিবাসরের নমস্কার !

সভা-শেষে আহারাদির পর রবিবাসরের সদস্য এবং অন্যান্য নিমন্ত্রিত ব্যক্তিগণ প্রস্থান করেছেন। একতলার দক্ষিণ দিকের বারান্দায় শরৎচন্দ্র বসেছেন আহারে,—গৃহকর্ত্রী, 'কয়লাওয়ালা'র পুত্রবধূ সামনে ব'সে খাওয়াচ্ছেন। শরৎচন্দ্র বললেন, "আমি পেটরোগা মানুষ, আমার জন্যে এত ব্যবস্থা করেছ মলু ?"

মলিনা বললেন, "এ সব আমি কম মসলা দিয়ে কুকারে নিজে রেঁধেছি শরৎদাদা। তুমি খাও, কোনো অসুখ করবে না।"

পাশে ব'সে সামতাবেড়ের চার-পাঁচ বছর আগেকার সে দিনের কথা মনে ক'রে আমার চোখে জল আসে। এমন ষোল আনা পাল্‌টানো একমাত্র শরৎচন্দ্রের মতো কোমল এবং কঠোর প্রকৃতির মানুষের পক্ষেই সম্ভব।

দীর্ঘকথিত স্মৃতিকথার এইখানেই শেষ।

বলার শেষ হ'ল, কিন্তু কথার শেষ হ'ল কই ? কত অকথিত কথা

নিরুপায় নৈরাশ্যে আমার মুখের দিকে তাকিয়ে বলছে, কি সর্বনাশ! হঠাৎ দাঁড়ি টেনে দিলে? আমাদের ভাষা দিলে না কেন, আমাদের শেষ করলে না কেন?

কিন্তু শেষ কি কিছুর সত্যি সত্যিই করা যায়? মৃত্যু যেদিন উপস্থিত হয়ে জীবনের প্রান্তে দাঁড়ি টানে, সেদিনও তো মনে হয়, কত অসম্পূর্ণ কাজ বাকি র'য়ে গেল, শেষ হ'ল না। স্মৃতিকথারই কি শেষ আছে?

॥ সমাপ্ত ॥